অক্টোবর-ডিসেম্বর 1997

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

ঊনবিংশ বর্ষ   চতুর্থ সংখ্যা   দাম পাঁচ টাকা

পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থা : কেমন হলে ভালো হয়
ডাক্তার-রোগী সম্পর্ক : কিছু সমস্যা, কিছু প্রস্তাব
হাসপাতালের বর্জ্য এবং মানুষের স্বাস্থ্যবিধি
পরিবেশের নানান আইন-কানুন নিয়ে কিছু অজানা কথা
জোসেফ নীডহাম : প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসু

বিজ্ঞান
ও
বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ 19 সংখ্যা 4
অক্টোবর-ডিসেম্বর 1997

সূচিপত্র

আমাদের কথা ... 1
রোগীর অধিকার ... 2
একজন সরকারি ডাক্তার হিসাবে ... 5
Memorandum for the protection ... 7
বিষয় : পরিবেশ
  পরিবেশ আইন-কানুন... 9
রিপোর্ট
  শহুরে আবর্জনা ও হাসপাতালের বর্জ্য ... 13
পুস্তক পরিচিতি :
  আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি ...17
রচনাপঞ্জী ... 21

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
P 252, লেকটাউন, ব্লক A
কলকাতা 700 089

আমাদের কথা

এ রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার যা হাল তাতে সকলেই আতঙ্কিত যে হঠাৎ পরিবারের কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি কি করবেন বা কোথায় যাবেন। সরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোম যেখানেই যান নিশ্চিন্ত হওয়ার যো নেই। সরকারি হাসপাতালে এক ধরণের সমস্যা আবার নার্সিংহোমে অন্যরকম। সরকারি হাসপাতাল মানেই অব্যবস্থার চূড়ান্ত। আর ছোটোখাটো নাম না জানা নার্সিংহোম মানে কোনো ব্যবস্থাই নেই সেখানে। নামজাদা হলে অন্য বিপদ। তাদের ঠাটবাটের ঠেলায় অস্থির। চিকিৎসা যেমনই হোক এক ধাক্কায় ফকির বনতে হবে।

প্রকৃতিগতভাবে এই সমস্ত চিকিৎসা কেন্দ্র আলাদা হলেও একটি ব্যাপারে এককাট্টা। চিকিৎসা কী হচ্ছে কেন হচ্ছে ইত্যাদি প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে বাধ্য নয় কেউ-ই। ভাবখানা যেন 'এসব প্রশ্নের উত্তর জেনে আপনার লাভ? —বুঝবেন কি কিছু চিকিৎসার?' অর্থাৎ আপনাকে মুখ বুজে দেখে যেতে হবে ওঁরা যাই করুন — ঠিক কিংবা বেঠিক।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীর বাড়ির লোককে নির্দিষ্ট সময়ে রোগীর অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট করার ব্যবস্থা অবশ্যি আছে। তবে সে ব্যবস্থা নেহাতই মামুলি। —'এখন ভালো আছে, আমরা দেখছি, চব্বিশ ঘন্টা না গেলে কিছু বলা যাচ্ছে না' —হেন 'রিপোর্টিং'। সেখানে চিকিৎসা সংক্রান্ত আলোচনার ফুরসৎ-ই নেই। সময় হয়তো বরাদ্দ গড়ে মাথাপিছু তিরিশ কি পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড! এর ফলে চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে রোগী কিংবা তার বাড়ির লোকের কোনো ভূমিকাই থাকে না —শুধু উদ্বিগ্ন হয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া। এর ফলে নানানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় রোগী এবং তার বাড়ির লোককে। সব থেকে বিপজ্জনক এক সমস্যা দেখা দিয়েছে সম্প্রতি চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রচুর সংখ্যার প্রতারক ঢুকে পড়ায়। আধুনিক যন্ত্রনির্ভর এক ধরণের চিকিৎসা ব্যবস্থা গজিয়ে উঠেছে সব দেশের মতো এদেশেও। এরা যন্ত্রপাতির ভোজবাজি দেখিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দুইয়ে নিচ্ছে লোকের পকেট থেকে। এদের রুখবার কোনো ব্যবস্থা নেই।

এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে সমস্যাটি পর্যালোচনা করা হয়েছে এই সংখ্যার *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*-তে। এই সম্পর্কে কিছু পদক্ষেপের কথাও ভাবা হয়েছে। সকলের কাছে আবেদন আপনারাও উদ্যোগী হোন এ ব্যাপারে এবং কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় ভাবুন। এ-ধরণের যে কোনো উদ্যোগে শরিক হতে আগ্রহী *বিওবি*, চাইলে আপনাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠাতে পারেন *বিওবি* দপ্তরে। এ নিয়ে কি করা যায় আপনাকে ভাবতে সাহায্য করতে পারে *বিওবি*। □

রোগীদের অধিকার : অভিজ্ঞতা ও প্রস্তাব

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

আমার পিসিমার বয়স ৮৬। অসুস্থ। স্থানীয় চিকিৎসক আসেন। অসুখ আন্ত্রিক এবং প্রস্রাব না হওয়া। তার পরামর্শ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। আঞ্চলিক হাসপাতাল সম্পর্কে আস্থা ছিল না। কাছাকাছি নার্সিংহোমে খোঁজ নেওয়া হয়। সেখানে জায়গা নেই অথবা জরুরি অবস্থায় রোগী নেওয়ার ব্যবস্থা নেই। বন্ধু চিকিৎসকের সহায়তায় দক্ষিণ কলকাতার এক দামী নার্সিংহোমে পিসিমাকে নিয়ে গেলাম। এমার্জেন্সিতে যে চিকিৎসক ছিলেন তিনি একটু দেখেই আই টি ইউ-তে পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে একটা প্রেসক্রিপশন দেওয়া হল। আমি নার্সিংহোমের ওষুধের দোকান থেকে ওষুধপত্র কিনে দিলাম।

এরপর থেকে আমার কাজ দুবেলা ভিজিটিং আওয়ার্সে যাওয়া, সিস্টারের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন চেয়ে নেওয়া ওষুধপত্র কিনে দেওয়া। দাম কখনও আড়াই হাজার টাকা, কখনও চারশ টাকা, সিস্টারকে 'পিসিমা কেমন আছে' জিজ্ঞাসা করলে উত্তর ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন। ডাক্তারকে খুঁজে বেড়ানো, খুঁজে পেলে আমার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর : হার্টে একটু প্রবলেম আছে, দেখছি। প্রেসারটা ঠিক নেই আমরা অবজারভেশনে রেখেছি! পরদিন আবার যাওয়া, আবার ওষুধ কিনে দেওয়া আবার একই ধরণের উত্তর পাওয়া। এটা প্রবলেম আছে। ওটা ঠিক নেই। পিসিমা আই টি ইউ-তে থাকছে। আমার এক চিকিৎসক বন্ধু ফোন করেছিল একটা কাজে, পিসিমার ব্যাপারটা শুনল। পিসিমাকে চিনত, বার দুয়েক দেখেছে। নার্সিংহোমে দেখতে গেল। আই টি ইউ-এর জুনিয়র ডাক্তাররা ওর পরিচিত। সতীর্থ। ও নিজেও একটা নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত। বিষয়টা জানা-বোঝা আছে। ও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করল। কেন পিসিমাকে আই সি ইউ-তে রেখে দেওয়া হয়েছে। এখানে কি এমন বাড়তি করা হচ্ছে যা জেনারেল বেডে করা যাবে না। কি এখানে জানা যাচ্ছে যা জেনারেল বেডে জানা যাবে না। যা যা জানার তা একবারে জেনে নিয়ে মতামত দাও। তারপর চিকিৎসা করতে চাইলে জেনারেল বেডে। চিকিৎসা করার না থাকলে রিলিজ করা। অবজারভেশনের নামে তো সবসময় সবাইকে আই টি ইউ-তে রেখে দেওয়া যায়। কিন্তু দেওয়া কি ঠিক। জুনিয়র ডাক্তার সিনিয়র ডাক্তারকে বললেন পিসিমা জেনারেল বেডে চলে এল।

আমার কাজ একই থাকল। ভিজিটিং আওয়ার্সে সকাল বিকেল যাওয়া। সিস্টারের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ কিনে দেওয়া। ডাক্তারকে খুঁজে ফেরা, দেখা হলে দুতিনটে কথা শোনা। পিসিমার আজকে এটা কম, কালকে ওটা বেশি, এই টেস্টটা করতে হবে। ওই বিষয়টা একটু দেখতে হবে। উনি আজকের দিনটা থাকুন। পিসিমা থাকছে।

আবার আমার চিকিৎসক বন্ধু খোঁজ নিল। পিসিমা এখনও নার্সিংহোমে শুনে অবাক হলো। আবার নার্সিংহোমে গেল। আবার ওর সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলল। পিসিমার যা যা সমস্যা তা যে কোনো ৮৬ বছরের মানুষের থাকে। সে চিকিৎসা ঘরেই করা যায়। এই বয়সের কারোর সব কিছু ঠিক করে ছেড়ে দিতে গেলে কোনোদিনই ছেড়ে দেওয়া হবে না। নার্সিংহোমেই রেখে দিতে হবে। আবার জুনিয়র ডাক্তার বা সিনিয়র ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলল। আমাকে জানান হলো পিসিমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমি অ্যাম্বুলেন্স বুক করলাম। সিস্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম, রিলিজ অর্ডার কোথায়। বললেন, ডাক্তার আপনাকে দেখা করতে বলেছে। দেখা করলাম। ডাক্তার বললেন, পিসিমার অবস্থা ক্রিটিকাল, উনি লিখে দেবেন রিলিজ অন্ রিকোয়েস্ট। মেডিক্যাল ক্যাটাসট্রপি হতে পারে, সি মাইট এক্সপায়ার্ড। আমি ভয় পেলাম। পিসিমা নার্সিংহোমে থেকে গেল।

আমার কাজ একই রকম চলল। একদিন ফোন এল অবস্থা ক্রিটিকাল। আবার আই টি ইউ-তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্লাড লাগবে। আমি রক্ত কিনে দিয়ে এলাম। পিসিমা আই টি ইউ-তে। চারিদিকে যন্ত্রপাতি। ততদিনে প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে। ভালো হচ্ছে না, ক্রমশ খারাপ হয়ে চলেছে। আমি কথা বলতে গেলাম আমার আর এক বন্ধু—চিকিৎসক-বন্ধুর কাছে। সে পিসিমাকে জানত দু-একবার দেখেওছে। আমার কাছে সব শুনল। বলল পিসিমা বেশিদিন বাঁচবে না। যেভাবে ওঁকে রাখা হচ্ছে তাতে উনি কোনোদিনই সুস্থ হবেন না। ওঁকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হবে। কষ্ট দিয়ে। এটা টেস্ট করে ওটা টেস্ট করে,

এই যন্ত্র লাগিয়ে ওই যন্ত্র লাগিয়ে এবং প্রত্যেকবারই ওঁর কষ্ট হচ্ছে। এই বয়সে দরকার একটু যত্ন, সেবা সহানুভূতি ভালোবাসা। বলল, ওর জানা এক নার্সিংহোম আছে সেখানে ওকে রেখে সেবা ও যত্নের চেষ্টা করা হবে। আমি যেন ডাক্তারকে অনুরোধ করি পিসিমাকে আই টি ইউ থেকে জেনারেল বেডে দিয়ে দিতে তারপর বন্ড দিয়ে পিসিমাকে ওখান থেকে নিয়ে আসি। আমি নার্সিংহোমের ডাক্তারকে অনুরোধ করি। তিনি চেষ্টা করবেন বললেন।

এরমধ্যে আমার সেই প্রথম বন্ধু চিকিৎসক আবার খোঁজ নেয়। আবার নার্সিংহোমে যায়। আবার সতীর্থ জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলি।

সে আমাকে জানায় পিসিমার ফাইলটা ও পড়েছে। পিসিমা ডেথ বেডে। আমি যেন এক্ষুনি বন্ড দিয়ে পিসিমাকে এখান থেকে নিয়ে যাই। এরা কখনই আই টি ইউ থেকে পিসিমাকে ছাড়বে না। যন্ত্রপাতি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে। আমার আরো এক লাখ টাকা খরচ হবে।

আমি পিসিমাকে বন্ড দিয়ে এই নার্সিংহোম থেকে আমার দ্বিতীয় চিকিৎসক বন্ধুর চেনা নার্সিংহোমে নিয়ে গেলাম। রাত্রে বন্ধু ফোন করে জানাল, আগের নার্সিংহোম পিসিমাকে চরম অযত্ন করেছে। মাথার পিছনে রক্তের চাপ, মনে হয় পড়ে গিয়েছিল। পা ভেঙে গিয়েছে, দুটো উরু রক্ত জমে ফুলে গেছে। পিসিমার আগের অপারেশনের স্টিল প্লেট বেরিয়ে এসেছে। সারা শরীরে বেডসোর।

পিসিমা মারা গেলেন। অযত্নে, অচিকিৎসায়, কষ্ট পেয়ে। পিসিমাকে আমি কলকাতার অন্যতম দামী নার্সিংহোমে রেখে ছিলাম। চিকিৎসায় প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। আমাকে বিরাট একটা বিল দিয়েছিল। কতসব টেস্ট করেছে আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি। পিসিমার পায়ে অনেক আগে অপারেশন করা হয়েছিল, না জেনে ফিজিওথেরাপি করেছে, আমাকে বলেনি। আমি শুধু টাকা দিয়ে গেছি।

চিকিৎসা নিয়ে আমার এই অভিজ্ঞতা যখন বন্ধুদের বলেছি দেখলাম অনেকেরই একই অভিজ্ঞতা।

যখনই নার্সিংহোমে দেখেছি সবসময় সংকোচে থেকেছি। সবসময় মনে হয়েছে আমি ডাক্তার নার্স স্টাফ সবার করুণাপ্রার্থী। কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভয় পেয়েছি। আমি এটা জিজ্ঞাসা করতে পারি তো। আমার পিসিমার বাঁচা-মরা সব এদের হাতে। আমার কাজ শুধু এরা যা বলছে শুনে যাওয়া করে যাওয়া টাকা দিয়ে যাওয়া। প্রশ্ন নয়, জানা নয়।

আমার এই অভিজ্ঞতা থেকে এবং বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে রোগীদের কিছু অধিকার থাকা দরকার। রোগী মানেই ডাক্তারের কাছে, নার্সিংহোমের কাছে, হাসপাতালের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ নয়।

রোগীদের অধিকার বিষয়ে আমার ধারণা লিখে ফেলি মতামত/ আলোচনার জন্য :

রোগী হাসপাতালে/নার্সিংহোমে ভর্তি হবার পর তার সম্পর্কে একটা রিপোর্ট/রেকর্ড/প্রোফাইল তৈরি করা হয়। রোগীকে দেখেন নার্স এবং জুনিয়র ডাক্তার। তারা দুজনে সিনিয়র ডাক্তারকে জানান। নার্স ও জুনিয়র ডাক্তারের নোট ফাইলে থাকে। সিনিয়র ডাক্তার সেটা দেখেন। দেখে এবং কথা বলে নির্দেশ দেন। সেটা ফাইলে থাকে। প্রেসক্রিপশন লেখা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই প্রেসক্রিপশন রোগীর বাড়ির লোককে দেওয়া হয় ওষুধ এনে দেবার জন্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাসপাতাল/নার্সিংহোম নিজেরাই ওষুধ দিয়ে দেয়। রোগীর কোনো টেস্ট করতে হলে নার্স প্যাথলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে জানিয়ে দেন। টেস্টের রিপোর্ট জমা পড়ে।

রোগীর দৈনন্দিন অবস্থা সম্পর্কে রোগীর বাড়ির লোকরা কিছুই জানতে পারেছেন না। তারা ২য় প্রেসক্রিপশন পেয়ে ওষুধ কিনে দিচ্ছে। এবং হয়তো মাঝে মাঝে শুনছে এই টেস্ট হয়েছে ওই টেস্ট করতে হবে।

রোগী সম্পর্কে তথ্য/ধারণা/মতামত এ সবই থাকছে শুধু নার্স, জুনিয়র ডাক্তার, সিনিয়র ডাক্তারের এর কাছে।

এর মধ্যে আরেকটা ব্যবস্থা আছে। ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর বাড়ির লোকদের দেখা করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডাক্তারকে পাওয়া যায় না। পেলেও খুব অল্প সময়ের জন্য। এবং কথাও খুব সাধারণ ভাষায়। 'ভালো আছে' 'খারাপ আছে', 'এটা ভালো না', 'ওটা খারাপ', 'এটা দেখতে হবে', 'ওটা করতে হবে' — এই ধরণের।

এই ব্যবস্থায়/কাঠামোয় কয়েকটা ধারণা রয়েছে। যে ধারণা স্বীকৃতিও পেয়েছে।

রোগীর শরীর সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত জটিল, তা কেবল চিকিৎসকরাই বুঝতে পারেন, সাধারণের বোধগম্য নয়। শরীর সংক্রান্ত ভাষা সাধারণরা বুঝবে না, তাদের বোঝার দরকার নেই। তারা বুঝে কি করবে। চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সিদ্ধান্ত

ও অধিকার চিকিৎসকদের।

অতএব রোগীর শরীর সংক্রান্ত তথ্য চিকিৎসকদের সম্পত্তি, এবং গোপনীয়। এর থেকে এই ধারণা মেনে নেওয়া হয় যে, রোগীর ওপর অধিকার চিকিৎসকের। এখানেই চিকিৎসকের ক্ষমতার সূত্র তৈরি হয়।

আমরা এই ধারণার বিপরীতে/বিরুদ্ধে কয়েকটি ধারণা রাখছি। রোগীর শরীরের ওপর অধিকার রোগীর অথবা তার সম্মতিতে তার আত্মীয়দের—চিকিৎসকদের নয়। চিকিৎসক রোগীর শরীরের এক বা একাধিক অসুস্থতাকে সুস্থ করার দায়িত্ব পান। রোগীর শরীরের অধিকার পান না। চিকিৎসক-রোগী সম্পর্ক এই দায়িত্ব-অধিকার সম্পর্ক। চিকিৎসকের দায়িত্ব রোগীর অধিকার স্বীকার করা। এই স্বীকৃতিতে রোগীর শরীর সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য রোগীকে জানানো। এই তথ্য চিকিৎসকের সম্পত্তি নয়। রোগীর সম্পত্তি, তার ওপর রোগীর অধিকার রয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে রোগী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তিনি এই চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করাবেন কিনা, এই অসুখ আর চিকিৎসা করবেন কি না, এই অসুখ এইভাবে চিকিৎসা করবেন কিঁ না, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে থাকবেন কিনা। এই অসুখে প্রস্তাবিত ওষুধ গ্রহণ করবেন কিনা। প্রস্তাবিত পরীক্ষা করাবেন কিনা। এই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না যদি না তার শরীর সংক্রান্ত তথ্য না পাওয়া যায়। তথ্য না দেওয়ার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসকরা সিদ্ধান্তে তাদের অধিপত্য, ক্ষমতা ও অধিকার একচেটিয়া করে নেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ায় রোগীর সুযোগ ও অধিকার অস্বীকার করেন।

অথচ তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। তথ্য সংগৃহীত হয়। নথিভুক্ত করা হয়। কিছু কিছু তথ্য প্রতিদিন রোগীর অভিভাবককে জানানো হয়। যেমন ওষুধের প্রেসক্রিপশন অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের বিল ওষুধের প্রেসক্রিপশন যখন দেওয়া হয়, তখন এটা তৈরির পিছনে একটা তথ্য আছে। প্রেসক্রিপশন জানানো হচ্ছে অথচ তথ্য জানানো হচ্ছে না। যে তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রেসক্রিপশন লেখা হয়েছে। সেই তথ্য জানলে সুযোগ থাকে ওষুধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার। কিছু কিছু ওষুধ হয়তো রোগী অথবা রোগীর অভিভাবক রোগীর শরীরে প্রবেশ নাও করতে চাইতে পারেন। তাদের অভিজ্ঞতা/জ্ঞান অথবা তাদের পরিচিত অন্যান্যদের মতামতের ভিত্তিতে। তথ্য না জানলে এই সুযোগ থাকছে না।

অ্যাকাউন্টস সেকশানের তৈরি বিলে জানানো হয়, কোন টেস্ট করা হয়েছে এবং তার জন্য কত টাকা দিতে হবে। কত টাকা দিতে হবে জানানো হয় অথচ টেস্টের রিপোর্টে কি বেরিয়েছে, তাতে রোগীর শরীরের কোনো অবস্থা প্রমাণিত হয় তা জানানো হয় না। অথচ রোগীর শরীরসংক্রান্ত পরীক্ষার রিপোর্ট রোগীর সম্পত্তি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই সমস্ত রিপোর্ট চিকিৎসা শেষে রোগীকে দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন তা চিকিৎসকের সম্পত্তি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কয়েকটা প্রস্তাব রাখছি।

এক. রোগীর শরীর সংক্রান্ত প্রতিদিন যে তথ্য নার্স জুনিয়র ডাক্তার সিনিয়র ডাক্তার তৈরি করেন, লিপিবদ্ধ করেন, নথিভুক্ত করেন, তা চিকিৎসকের সম্পত্তি নয়। রোগীর সম্পত্তি। এই পেশেন্ট প্রোফাইল প্রতিদিন রোগীকে/রোগীর অভিভাবককে দিতে হবে। তাতে থাকবে গতকাল রোগীর অবস্থা কি ছিল, তার কি কি চিকিৎসা হয়েছে, কি কি পরীক্ষা হয়েছে, পরীক্ষা থেকে কি কি জানা গেছে, চিকিৎসার ফলে আজ কেমন আছে, আজকে কি কি শারীরিক অসুস্থতা আছে।

দুই. এই তথ্যের ভিত্তিতে চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা। আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ও সময় বলা থাকবে। তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

তিন. ওষুধের প্রেসক্রিপশনের কোন্ ওষুধ কোন্ কাজে লাগবে বলে ভাবা হচ্ছে, তার উল্লেখ থাকবে। জেনেরিক নাম উল্লেখ করতে হবে যাতে অল্পদামে ওষুধ কেনা যায়।

চার. কোনো পরীক্ষা করার আগে রোগী অথবা রোগীর অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে। এই পরীক্ষা কেন করা হচ্ছে, এর মাধ্যমে কি জানা যাবে, সেটা জেনে চিকিৎসার কি কাজে লাগবে, এই পরীক্ষার কোনো প্রতিক্রিয়া রোগীর শরীরে হতে পারে কি না, এর জন্য কত খরচ হবে এইসব তথ্য জানাতে হবে।

পাঁচ. রোগীর চিকিৎসায় কোনো যন্ত্র ব্যবহার করার আগে রোগীকে অথবা রোগীর অভিভাবককে জানাতে হবে। কেন এই যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা না ব্যবহার করা হলে রোগীর কতটা ক্ষতি হতে পারে, এটা ব্যবহার করার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, এর জন্য কত খরচ লাগবে এইসব।

ছয়. রোগীকে প্রাথমিক পরীক্ষার পর চিকিৎসক রোগীকে/রোগীর অভিভাবককে গিয়ে জানাবেন রোগীর কি অসুখ করেছে বলে তিনি মনে করছেন। এর চিকিৎসা কি? কতদিন লাগতে পারে,

এর পর 14 পৃষ্ঠায় ☞

একজন সরকারি ডাক্তার হিসাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আমি যা চাই

তন্ময় চৌধুরী

সরকারি হাসপাতালে কর্মরত একজন চিকিৎসক মনে করছেন কিছু কিছু পদক্ষেপ হাসপাতাল তথা পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কিছু উন্নতি ঘটাতে পারে। ওঁর প্রস্তাবগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্য লিখিত। বিওবির মাধ্যমে তিনি সেখানে পৌঁছতে চেয়েছেন। সরকার অবধি পৌঁছলে আমরা খুশি হব। তবে ওঁর প্রস্তাবগুলি আলোচনা হতেই পারে। এই মর্মে নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া জানতে আগ্রহী আমরা। স. ম.

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৃহত্তম দপ্তর হলো স্বাস্থ্য দপ্তর। কিন্তু 1947-র পর থেকে যেন এই দপ্তরটির কাজে সবাই হতাশ। রজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেন আজ সকলেরই করুণার পাত্র। কিন্তু মাত্র পনেরো বছর আগেও অবস্থাটা অন্যরকম ছিল। একজন ডাক্তার হিসারে সহকর্মীদের আড্ডায় কান ফেরালে ঘুরে-ফিরে যে কথাগুলো বারবার উঠে আসে তা হলো এক, বদলির সমস্যা— গ্রামে কর্মরত ডাক্তার বন্ধুদের মধ্যে একটা আশঙ্কা আজ তীব্র যে তারা কি কোনোদিন বদলি হবেন ও—কি করেই বা হবেন? দুই, প্রশাসক ডাক্তারদের অবহেলিত হবার সমস্যা; তিন, নিরাপত্তার সমস্যা; চার, মেডিকেল এডুকেশন সার্ভিস (এম.ই.এস.)-এ কর্মরত ডাক্তারদের বিভিন্ন সমস্যা; পাঁচ, উচ্চ শিক্ষার সমস্যা; ছয়, সরকারি তহবিলে অর্থাভাবের সমস্যা।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী গত 9 মার্চ ডাক্তারদের সংগঠন এ. এইচ. এস. ডি-র সভায় ভাষণ দানের সময় বলেছেন যে, বদলি নীতি তিনি এখনও বুঝে উঠতে পারেন নি। সত্যি কথা বলতে কি সরকারি বদলি নীতি একটা নামকাওয়াস্তে থাকলে তা কতটা মেনে চলা হয়, আর কতটাই বা মেনে চলা সম্ভব তা ভগবান(!)ই বলতে পারবেন। একটা কথা অবশ্যই বলা যায় যে, বদলি কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে হয় না। কেবল কয়েকজনের মর্জিমাফিক এতদিন বদলি হয়ে এসেছে তাই অ্যানাসথেসিয়োলজিস্টকে ব্লাড ব্যাঙ্কের দায়িত্বে পাঠানো হয়, আসলে বিগত দু-বছরে প্রতিটি হাসপাতালে রোগীর চাপ বেড়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তালে তালে কিন্তু তার সাথে সঙ্গতি রেখে হাসপাতালগুলিতে নিযুক্ত ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ে নি, কোনো এস্টাব্লিশমেন্ট টেবিল তৈরি করবার জন্য সরকার উদ্যোগী হয় নি। রোগীর সংখ্যার তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা অল্প হওয়ায় হাসপাতালগুলো প্রায় পঙ্গু। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে গেছে। অথচ একটা কম্পিউটারের সাহায্যে এস্টাব্লিশমেন্ট টেবিল তৈরির কাজটা একমাসের মধ্যেই করে ফেলা যায়। এই হিসেবটা তৈরি হলেই বোঝা যাবে যে, জেলা সদর মহকুমা এবং টিচিং হাসপাতালে কোথায় কত লোক বাড়তি আছে বা কমতি আছে। কত ডাক্তার প্রতি বছর অবসর নেবেন, কোন্ জেলায় কত ডাক্তার কত বছর আছেন, তাকে কোথায় বদলি করা যেতে পারে, ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় কথা প্রতি বছর কতজন করে সরকারি ডাক্তার লাগবে সেই হিসেবটাও বেরিয়ে আসতে পারে এই ছক থেকে। এই নতুন ডাক্তাররাই তো গিয়ে গ্রামে কর্মরত ডাক্তাদের অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

এবার সবশেষে উল্লিখিত সমস্যার দিকে প্রথম চোখ ফেরানো যাক। সত্যি সত্যিই সরকারি তহবিলে অর্থের অভাব আছে। কিন্তু যেটার অভাব নেই বা যেটা সরকার সতত যোগান দিতে পারে, সেটা হলো 'ম্যান পাওয়ার'। বিশ্বমানের যুগে আজ বেসরকারি পুঁজিকে জায়গা না করে দিলে এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা সত্যিই অসম্ভব। বেসরকারি উদ্যোগকে প্রয়োজনে মেলাতে হবে। কিভাবে তা করা যায় তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ধরুন আজ পিয়ারলেসকে বলা হলো মুর্শিদাবাদে বা মালদায় সরকারি হাসপাতালেই একটি আলট্রা সাউন্ড, একটি সিটি স্ক্যান, একটি অটো অ্যানালাইসার বসাতে—বদলে সরকার তাঁকে সেগুলি চালাবার জন্য বিশেষজ্ঞ দিলেন আর প্রতিটি পরীক্ষা সরকার নির্ধারিত মূল্যে (বাজারের চেয়ে কম) করবার ব্যবস্থা করলেন। হাসপাতাল চলাকালীন সময়ের বাইরে বেসরকারি সংস্থাকে বাইরের পরীক্ষা নিরীক্ষা তাদের নির্ধারিত মূল্যেই করবার সুযোগ দেওয়া হলো। এইভাবে জেলার স্বাস্থ্য-চিত্রটাই

পালটে দেওয়া সম্ভব বলে মনে হয়। এখানে সরকারের কাজ হল বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা বাড়িয়ে তাদের জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া।

অন্য যে কোনো রাজ্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে উচ্চ শিক্ষার জন্য (এম. ডি / এম. এস) যে সিট, তার 60%-75% সরকারি সার্ভিসে নিযুক্ত ডাক্তারদের জন্য সংরক্ষিত। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। ভ্রান্ত নীতির জন্যেই আজও প্রতিটি হাসপাতালে প্যাথলজি, অ্যানাসথেসিয়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি. মাইক্রোবায়োলজি, রেডিওলজি. পিডিয়াট্রিক্স. আর্থোপেডিকস প্রভৃতি বিভাগে ডাক্তারের অভাব। বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের শর্ত অনুযায়ী এই সমস্ত ব্রাঞ্চের লোকের দরকার আগামীদিনে আরও বাড়বে। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী একটু উদ্যোগী হয়ে সরকারী ডাক্তারদের জন্য সংরক্ষণ না বাড়ালে আগামীতে এই সমস্যা সাংঘাতিক রূপ ধারণ করবে। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষার্থী ডাক্তারদের সরকারি কাজে যুক্ত থাকার জন্য বন্ডের ব্যবস্থাও থাকা দরকার। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এটাও ভেবে দেখা উচিত যে, সার্ভিসের ডাক্তারদের এম ডি/এম এস করায় সরকারের বাড়তি কোনো খরচ হচ্ছে না। বরং হাসপাতালে সে স্বাভাবিকের থেকে বেশি কাজ করতে পারে।

মেডিকেল এডুকেশন সার্ভিস(এম. ই. এস)- এ কর্মরত ডাক্তারদের জন্য আমার মনে হয় অবিলম্বে কিছু পে ক্লিনিক এর ব্যবস্থা করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন হলে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির স্পনসরশিপও জোগাড় করা যেতে পারে। তারাই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিতে পারে। একথা অনস্বীকার্য, আজ শুধু পরিকল্পনার অভাবে এম. ই. এস-দের যথাযথ ব্যবহার হতে পারছে না।

হাসপাতালগুলো আজ সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই এর জন্য হাসপাতালের পঙ্গু প্রশাসন দায়ী। হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কিয়দংশের সঙ্গে সমাজবিরোধীদের গাঁটছড়ার কথা কারও অজানা নয়। বামফ্রন্ট সরকার অন্তত স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জেলার বাইরে বদলির প্রথা চালু করতে পারে। এবং সেটাই সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু হাসপাতাল বেছে নিয়ে যাতে করা যায় তার ব্যবস্থা নিতে পারে। সেখানে চুক্তির ভিত্তিতে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করে দেখতে পাবে। মনে হয় এতে কাজকর্মের উন্নতির সঙ্গে চিকিৎসকদের নিরাপত্তাও ফিরে আসবে। এর সঙ্গে সরকারি প্রচার মাধ্যমে এই প্রচারটাও থাকা দরকার যে, স্বাস্থ্য দপ্তর প্রচুর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কর্ম-সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। এও প্রচার করতে হবে যে, মারধর করে কোনো সমস্যারই সমাধান করা যায় না।

প্রশাসক ডাক্তার আজকাল আর কেউ হতে চান না। যারা হন তাদেরকে অনেক সময়ই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কাজে পাঠানো হয়। ফলত তাঁরা তাঁদের নৈপুণ্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখাবার ইচ্ছাটাকেও হারিয়ে ফেলে অকর্মণ্য আমলায় পরিণত হন। অথচ প্রতি জেলায় অন্তত একজন করে সৎ, রাজনৈতিক সদিচ্ছাযুক্ত, দায়বদ্ধ প্রশাসকের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিলে স্বাস্থ্যচিত্র বদলাতে বাধ্য। পাশাপাশি এটাও মনে রাখা দরকার যে, বিভিন্ন ভাতা ইত্যাদি দিয়ে প্রশাসকের পদগুলির হৃতমর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আমাদের রাজ্যে হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রশাসনের ওপর কোনো মাস্টার ডিগ্রির কোর্স নেই। জোকার-অধ্যাত্মবাদ নয়—এ. আই. আই. পি. এইচ এর সাথে এম. এইচ. এ. জাতীয় কোর্সের মাধ্যমে উপযুক্ত স্বাস্থ্য প্রসাশক তৈরির দিকে অবিলম্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নজর দেওয়া দরকার। আমার মনে হয়, রাজনৈতিক সদিচ্ছার সঙ্গে উপযুক্ত পরিকল্পনা থাকলে মাত্র ছ-মাসেই স্বাস্থ্য দপ্তরের হাল ফিরিয়ে দেওয়া যায়। ☐

পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক 'অর্চনা গুহ মামলা' সংক্রান্ত বই **সৌমেন গুহ** সম্পাদিত

BATTLE OF 'ARCHANA GUHA CASE' Rs. 200.00

উজ্জ্বল অন্ধকার দাম ১৫০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : এল/ডি-৫ কুষ্টিয়া (অবন্তিকা) আবাসন, কলকাতা ৭০০ ০৩৯

MEMORANDUM FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS OF PHYSICALLY ILL PERSONS

অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। অথবা হাসপাতালে কিংবা নার্সিংহোমে। সুস্থ হয়ে উঠবে রোগী। এ নিয়ে ভাবনার কি? — এমনটাই ছিল রীতি। কিন্তু এখন আর এতটা নিশ্চিন্ত থাকা যাচ্ছে না। চিকিৎসা নিতে গিয়ে নানান তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে অনেককেই। ফলে চিকিৎসা-প্রার্থী হিসেবে ডাক্তার বা চিকিৎসা-কেন্দ্র তার অবস্থানটি বা সেখানে তার অধিকারগুলো নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট হওয়াটা জরুরি হয়ে উঠেছে। সেই প্রয়োজন থেকেই 'অসুস্থ ব্যক্তির অধিকার' নামের এই সনদটি রচিত হয়েছে। এটি প্রণয়ন করেছেন সৌমেন গুহ। এ-সম্পর্কে সকলেই মতামত অথবা নির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠাতে পারেন বিওবি দপ্তরে।

স. ম.

1. As a citizen of India, any person who is in need of medical aid or treatment by rerason of physical disorder (hereafter referred to as a 'patient'), has the right to life enshrined by the Constitution of India (and the same right is also given to the mentally ill persons).

2. In any kind of medical aid or treatment of the patient, the preservation of human life is of paramount importance.

3. No patient shall be subjected during medical aid or treatment to any indignity (whether physical or mental) or cruelty.

4. Immediate medical attention and treatment should be ensure to patients in need, by the Government, medical institutions and individual medical practitioners.

5. No emergency patient should be denied medical care or refused by any medical institution or individual practitioner, and all possibilities should be explored to accomodate emergency patients in serious condition.

6. The name, age, sex, address and disease of the patient should be clearly recorded by the attending medical officer.

7. The date and time of attendance/examination/admission of the patient should be clearly recorded by the attending medical officer.

8. Whether and where the patient has been admitted, transferred and referred should be clearly indicated by the attending medical officer.

9. Register for recording all the above details should be maintained by the medical institution or individual practitioner.

10. The attending medical offiicer shall write his/her full name clearly and put his/her signature in the treatment document.

11. Every medical institution must perform a medical screening examination of all prospective patients, regardless of their ability to pay.

12. If a medical institution determines that a patient suffers from an emergency condition, the institution must stabilise that condition and the institution cannot transfer or discharge an unstable patient.

13. Whenever, any medical aid or treatment is availed of by the patient with the approval of the medical institution or individual practitioner, the patient hires or avails of any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment.

14. Medical aid or treatment is defective or deficient, where there are any fault, imperfection, shortcoming or inadequacy in the quality, nature and manner of medical aid or treatment which is required to be maintained by or has been undertaken to be performed by the medical institution or individual practioner in pursuance of the a contract or otherwise in relation to the medical aid or treatment.

15. The patient has the right to considerate and respectful medical aid or treatment.

16. The patient has the right to obtain from his/her physician complete current information concerning his/her diagnosis, treatment and prognosis in terms he/she can be reasonably expected to understand. When it is not medically advisable to give such information to the patient, the information should be made available to an appropriate person on his/her behalf.

17. The patient has the right to know, by name, the physician responsible for coordinating his/her medical aid or treatment.

18. The patient has the right to receive from his/her physician information necessary to give informed consent prior to the start of any procedure and/or treatment. Except in emergencies, such information for informed consent should include, but not necessarily be limited to, the specific procedures and/or treatment, the medically significant risks involved and the probable duration of incapacitation, and also the financial cost involved.

19. Where medically significiant alternatives for aid or treatment exist, or when the patient requests information concerning medical alternatives, the patient has the right to know the name of the person responsible for the procedures and/or treatment.

20. The patient has the right to refuse treatment to the extent permitted by law, and to be informed of the medical consequences of his/her action.

21. The patient hs the right of every consideration of his/her privacy concerning his/her own medical aid or treatment programme, which should be kept confidential and be treated discretely.

22. When medically permissible, a patient may be transferred to another facility only after he/she has received complete information and explanation concerning the needs for and alternative to such a transfer. The institution to which the patient is to be transferred must, first, have accepted the patient for transfer.

23. The patient has the right to obtain information as to any relationship of his/her institution to other institutions in so far as his/her medical aid or treatment is concerned, and he/she has the right to obtain information as to the professional relationships among individuals, by name, who are treating him/her.

24. The patient has the right to except reasonable continuity of medical aid or treatment, and to know in advance the relevant information about the time and place of availability of physician.

25. The patient has the right to expect that the medical institution or individual practitioner will provide a mechanism whereby he/she is informed of his/her continuing health care requirements following discharge.

26. The patient has the right to examine and receive an explanation of his/her bill regardless of source of payment.

27. The patient has the right to know the medical institution rules and regulations applicable to his/her conduct as a patient.

28. The patient has the right to know the generic or technical names and specifications of medicines, drugs, diagnostic procedures, medical and/or surgical supports and accessories, and their alternatives, in writing, insofar as his/her medical aid or treatment is concerned.

29. No patient under treatment shall be used for the purpose of demonstration, research or experimentation, unless the patient has given his/her consent in writhing or where such patient is incompetent, by reason of minority or otherwise, to give valid consent, the guardian or other person competent to give consent on his/her behalf, has given his/her consent in writing, for such demonstration, research or experimentation. □

তৃতীয় পর্ব

বিষয় : পরিবেশ

দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার উর্ধ্বে পরিবেশ কোন বিমূর্ত বিষয় নয়। মানুষের সৃষ্টি, স্থিতি ও কৃতি সবই পরিবেশ নির্ভর। লয়ও বোধহয় পরিবেশ ধ্বংসে। সমাজ-সংস্কৃতি-জীবিকা সবকিছুই আজ পরিবেশ দূষণের প্রচ্ছায়া উপচ্ছায়া কবলিত। বিজ্ঞান-কারিগরি পরিবেশ দূষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। দূষণ রোধেও বিজ্ঞান-কারিগরিকেই হাতিয়ার হয়ে উঠতে হবে ঠিকই, কিন্তু পরিবেশমুখী একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তদনুসারী আইনী, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ছাড়া দূষণ-রোধ সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়। এমই এক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধানের উদ্যোগ--বিষয় : পরিবেশ। যে কেউ এ-বিভাগের জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। কমবেশি দু-হাজার শব্দের মধ্যে। চিঠিপত্রে মতামত, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর খবরাখবর, টীকা সমীক্ষাদিও প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে।   সম.

পরিবেশ আইন-কানুন : নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

[দুই]

সেঁকব বলে রোদ্দুরেতে হৃদয় মেলে ধরে
আলট্রভায়োলেটের কোপে খাক হলো যে পুড়ে।
সাধ তো ছিল মুগ্ধ হবো স্নিগ্ধ সমীরণে
বিষাল মন, বিধুর হলো অম্ল-বরিষণে।
উজল রঙে উছল হবো ভীষণ দুরাশা।
খর-দূষণে বিছন বোনে ব্যাপ্ত কুয়াশা।
তীব্র ক্ষোভে গর্জে উঠি প্রবল প্রতিবাদে
শব্দ-বিভোর কর্ণকুহর, নীরবে প্রাণ কাঁদে।

পরিবেশের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত এমন ভারতীয় আইনের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। মোটামুটি তিনটে দলে এগুলিকে ফেলা যায় : এক, সরাসরি পরিবেশ সম্পর্কিতআইন ; দুই, নামে পরিবেশ আইনের আওতায় না পড়লেও পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত আইন ;এবং তিন, পরিবেশের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য আইন।

প্রথমদল নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা যাক। সারণী:1-এ এই দলভুক্ত কয়েকটি মূল আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিনিয়ম তথা রুলস্ ইত্যাদির একটি তালিকা দেওয়া হল। তালিকায় উল্লিখিত আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিনিয়মগুলির মধ্যেকার সাধারণ যোগসূত্রটি স্পষ্ট : এগুলি প্রধানত শিল্পসংস্থাকেন্দ্রিক। পরিবেশ সম্পর্কিত সরাসরি আইন আরও আছে বন ও বন্যপ্রাণীকেন্দ্রিক।

আলোচনার আগে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো, আইনী ব্যাপার-স্যাপার মোটেই সুস্থির নয়। প্রত্যেক আইনেই সরকার বা বিশেষ দপ্তর বা কর্তৃপক্ষের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে যাতে আইন সংশোধন করা যায়, নতুন বিধিনিয়ম তৈরি করা যায়, আদেশ বা নির্দেশ (order or directions) জারি করা যায়। 1974-এর জল...আইনের কাঠামোর মধ্যেই আইনটি 1978 ও 1988-তে সংশোধিত হয়েছে। বায়ু...আইনও (1981) সংশোধিত হয়েছে 1987-তে। এমনকি জনদায় বীমা আইনও 1991-তে প্রণীত হয়ে পরের বছরেই আবার সংশোধিত হয়েছে। আবার বাস্তব প্রয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট ইত্যাদির মাধ্যমে আইন বা বিধিনিয়মের নতুন ব্যাখ্যা (Interpretations) বা ফাঁকফোকর পূরণের উদ্দেশ্যে আদেশ-নির্দেশও জারি হচ্ছে। যেমনটি হয়েছে শব্দ দূষণের ক্ষেত্রে।...এমন একটি চলমান প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য উপস্থাপনার চেষ্টা এখানে আদৌ করা হচ্ছে না। বরং আইনের কাঠামো ও মৌলিক উদ্দেশ্য সংক্রান্ত ন্যূনতম কিছু তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আইনী প্রক্রিয়ার স্পিরিটটা ধরবার প্রয়াসেই এ-উদ্যোগ সীমিত।

আমাদের লক্ষ্য যদিও নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের আইনী স্বীকৃতি তথা উৎসাহের অনুসন্ধান, কিন্তু সেটা করতে গেলে বিভিন্ন আইনের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলোকেও যেমন চিহ্নিত করা দরকার, তেমনি দরকার আইন ও তার প্রয়োগের প্রেক্ষিতটাকেও খানিকটা অন্তত বোঝা। এজন্য সারণী : 1-এর আইন ও

বিধিনিয়মগুলির প্রাথমিক পরিচয় উপস্থাপিত করা হবে পাঁচটি সূত্র ধরে যথা—লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, বিধিবদ্ধ কৃত্য, আইন লঙ্ঘনকারীর বিচার ও শাস্তি, এবং নাগরিক অধিকার বা অংশগ্রহণের স্বীকৃতি।

আইনী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

জল (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1974 : নামের মধ্যেই উদ্দেশ্যটি ধরা পড়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে 'দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ' গঠন ও তাদের ক্ষমতা, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি চিহ্নিতকরণের মধ্যেই আইনী লক্ষ্যপূরণের প্রয়াস বিস্তৃত হয়েছে।

জল (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) কর আইন, 1977 : প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল কিছু কিছু শিল্পসংস্থা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত জলের ওপর কর ধার্য করা এবং আদায়ীকৃত কর থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ (নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) পর্ষদগুলির আংশিক অর্থসংস্থান করা।

বায়ু (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1981 : উদ্দেশ্য ও কাঠামোর দিক থেকে জল আইনেরই অনুসারী। বায়ু (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) পর্ষদ সমূহের সংগঠন ও কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মনীতিই প্রাধান্য পেয়েছে। তারই অনুষঙ্গে এসেছে বায়ু দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণমূলক ধারাসমূহ।

সারণি : 1

সরাসরি পরিবেশ সম্পর্কিত আইন (ক)

মূল আইন	অনুসারী বিধিনিয়ম ইত্যাদি
জল (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1974 [The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974]	জল (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিনিয়ম, 1975 [The Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975]
জল (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) কর আইন, 1977 [The Water (Prevention and Control of Pollution Cess Act, 1977]	জল (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) কর বিধিনিয়ম, 1978 [The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Rules, 1978]
বায়ু (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1981 [The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981]	বায়ু (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিনিয়ম, 1982 [The Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1982]
পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, 1986 [The Environment (Protection) Act, 1986]	পরিবেশ (সুরক্ষা) বিধিনিয়ম, 1986 [The Environment (Protection) Rules, 1986]
	বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের শিল্পোৎপাদন, মজুত ও আমদানি বিধিনিয়ম, 1989 [The Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989]
	বিপজ্জনক বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও ক্রিয়াকলাপ) বিধিনিয়ম, 1989 [The Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989]
	পরিবেশে প্রভাব মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তি, 1994 [Environmental Impact Assesment Notification, 1994]
জনদায় বীমা আইন, 1991 [Public Liability Insurance Act, 1991]	জনদায় বীমা বিধিনিয়ম, 1991 [The Public Liability Insurance, Rules 1991]
	জনদায় বীমা আইন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি, 1992 [Notification, Min. of Env. & Forests, 24.3.92]

পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, 1986 : মানুষ সহ প্রাণীকুল, উদ্ভিদকুল এবং সম্পদ তথা সামগ্রিক পরিবেশকে দূষণের প্রকোপ থেকে রক্ষা করা ও পরিবেশের গুণগত উন্নতিবিধান—এই উদ্দেশ্যেই আইনটি প্রণীত।

জনদায় বীমা আইন, 1991 : বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজ-কারবারের ফলে যদি দুর্ঘটনা ঘটে আর তা যদি জনসাধারণের ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয় তবে সেইসব মানুষের ত্রাণের দায় সংশ্লিষ্ট কারখানা/উদ্যোগের ওপর বর্তেছে এই আইনের সাহায্যে। এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের সীমিত ও আশু ত্রাণের সংস্থান করাই এই আইনের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন আইনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য তথা সংস্থান

জল আইন প্রয়োগের মূল কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়েছিল 'জলদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের' ওপরে। বায়ু আইন ঘোষণার পরে সেই আইন বলে 'বায়ু দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও' গড়ে তোলার সংস্থান রাখা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে যেখানে যেখানে ইতিমধ্যে 'জল দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ' গড়ে উঠেছিল বায়ু দূষণ আইন কার্যকর করার দায়িত্বও তাদের ওপরেই ন্যস্ত হয়। পরিবেশ আইন (1986) প্রণয়নের পর এদেরকে শুধুই 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ' হিসেবে অভিহিত করা হতে থাকে। পৃথকভাবে জল...বা বায়ু পর্ষদ বলা যেমন বন্ধ হলো, তেমনি 'নিবারণ' শব্দটিও বাদ পড়ল।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে জল বা বায়ু পরীক্ষার ল্যাবরেটরি গড়ে তুলতে পারে বা অন্য কোনো ল্যাবরেটরিকে অনুমোদন দিয়ে সেই কাজ করাতে পারে।

জল...আইনের 24, 25 ও 26 ধারা অনুযায়ী কোন শিল্প বা সংস্থা নদী, কূপ, জমি, জলাশয় বা নর্দমাতে ক্ষতিকারক বর্জ্য ফেলতে পারবে না। নতুন করে বর্জ্য ফেলার জন্য পর্ষদের কাছে আগাম অনুমোদন নিতে হবে। আগে থেকে বর্জ্য ফেলা চালু থাকলে আইন প্রণয়নের পর নতুন করে সেগুলির জন্যও অনুমোদন নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট রুলস-এ এ-সম্পর্কিত বিশদ পন্থা পদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়েছে।

বর্জ্য ফেলবার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত পাবার পর বিচার বিবেচনা, অনুসন্ধান ও পরিদর্শনাদি সেরে পর্ষদ অনুমোদন দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। তবে পর্ষদকে চারমাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে, অন্যথায় অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যাবে।

আইনের এইসব ধারা লঙ্ঘন করলে, দূষণ ঘটালে বা দূষণের সম্ভাবনা রোধেও বোর্ড শিল্প বা সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন। এই মামলার বিচার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসের চেয়ে নিম্ন বিচারালয়ে করা যাবে না। দোষী সাব্যস্ত হলে আইন লঙ্ঘনকারীর ন্যূনতম ও উর্ধ্বতম সাজা হতে পারে যথাক্রমে দেড় বছর ও ছবছর কারাবাস ও তৎসহ আর্থিক জরিমানা। জরিমানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয় নি। [অবশ্য অভিযুক্ত যদি প্রমাণ করতে পারেন যে দূষণ বা ত্রুটি ঘটে গেছে তাঁর/তাঁদের অজ্ঞাতসারে বা সম্ভাব্য সকল রকম সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও, তবে তাঁদের শাস্তি বা জরিমানা হবে না।]

বায়ু আইনের সংস্থানগুলিও মোটের ওপর জল আইনের সংস্থানের অনুরূপ। বায়ু আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকে 'বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ এলাকা' (Air Pollution Control Area) হিসেবে চিহ্নিত ও ঘোষণা করতে পারেন এবং বায়ু আইন এইসব এলাকাতেই প্রযোজ্য হবে। (প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার এলাকা বিশেষকে 'জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ এলাকা' হিসেবেও ঘোষণা করতে পারেন)।

বায়ু আইনের 21 ও 22 ধারা অনুযায়ী 'বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ এলাকায়' কোনো শিল্পসংস্থাই দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আগাম অনুমোদন ব্যতীত বাতাসে বর্জ্য ছাড়তে পারবে না। এবং অনুমোদন পেলেও দূষিত বর্জ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি বেঁধে দেওয়া সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। 31-A ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রয়োজনে যে কোনো দূষক শিল্প সংস্থার জল ও বিদ্যুতের যোগান নিয়ন্ত্রণ এমনকি বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারেন, এমনকি কারখানার কাজকর্ম আংশিক বা পূর্ণ বন্ধের নির্দেশ দেবার অধিকারও পর্ষদের আছে। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বর্জ্য জল বা গ্যাসের মধ্যে বিভিন্ন দূষক পদার্থের উর্ধ্বসীমা কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদই সাধারণত বেঁধে দেন, তবে ক্ষেত্রবিশেষে রাজ্য পর্ষদ সেই সীমা আরও কঠোর করতে পারেন, হাল্কা করতে পারবেন না)।...এইসব ধারা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার এক্তিয়ারও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের। বিচারের এক্তিয়ারও জল আইনের মতোই, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের। নিম্নতম ও উর্ধ্বতম সাজাও জল আইনের অনুরূপ। জল বা বায়ু উভয় আইনেই দোষী ব্যক্তি একই

অপরাধ চালিয়ে যেতে থাকলে বর্ধিত সাজার এবং/অথবা অর্থদণ্ডের বিধান আছে। তবে সেক্ষেত্রে নিম্নতম ও ঊর্ধ্বতম কারাবাসের মেয়াদ যথাক্রমে দুবছর ও সাত বছর।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা বলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণের নিয়ন্ত্রণ পর্যদকে সর্বাধিক এক বছরের জন্য রহিতও (Supersede) করতে পারেন।

পরিবেশ আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিনিয়মগুলির গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু ধারা অনুযায়ী—

☐ পরিবেশ দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের। এই ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন একদিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংস্থা/দপ্তরের মধ্যে কর্তৃত্বের এলাকা ভাগ করে দিতে পারেন, তেমনি নতুন পদও সৃষ্টি করে বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারেন। নতুন আইন বা আদেশ নির্দেশ জারি তো করতেই পারেন।

☐ বিভিন্ন ধরণের শিল্প-কারখানার জন্য জলীয় ও গ্যাসীয় বর্জ্যের পরিমাণ ও তাদের অন্তর্গত বিভিন্ন দূষকের উপস্থিতির সর্বোচ্চ মাত্রা নির্দিষ্ট হয়েছে। মোটর গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়া বাষ্পের মাত্রাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিবেশে শব্দ দূষণের সীমাও নির্দেশিত হয়েছে।

☐ জলীয় বা গ্যাসীয় বর্জ্য, জাহাজী বর্জ্য ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য বাদে অন্যান্য **বিপজ্জনক বর্জ্যকে** (hazardous wastes) 18টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে সেগুলির সংগ্রহ, সঞ্চয়, প্রক্রিয়াকরণ ও বর্জন (disposal) সংক্রান্ত বিধিনিষেধ জারি হয়েছে।

☐ গ্যাসীয় বা জলীয় বা বিপজ্জনক র্বজ্য ফেলার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন এমন যে কোনো শিল্পসংস্থাকে প্রতি বছর নির্ধারিত বয়ান অনুযায়ী 'পরিবেশ অডিট রিপোর্ট' (Environment Audit Report) জমা দিতে হবে। পরে এক সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে 'অডিট রিপোর্ট' নয় এটির নাম হবে 'পরিবেশ বিবৃতি' (Environment Statement)।

☐ 29 ধরণের বিজ্ঞাপিত শিল্পের ক্ষেত্রে 50 কোটি টাকা বা তার বেশি বিনিয়োগের বৃহৎ শিল্পের জন্য, এক কোটি বা তার বেশী বিনিয়োগের ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য এবং কয়েকটি শিল্পের বেলায় সব সময়েই, পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মূল্যায়ন রিপোর্ট যাচাই করবেন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ দপ্তরের একটি বিশেষ কমিটি।

☐ ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী 179টি বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের প্রত্যেকটির জন্য. নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ (Threshold Quantity) বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ নিয়ে ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত যাঁরা, তাঁদেরকে

i) বিপজ্জনক রাসায়নিক আমদানি, ব্যবহার ও ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে এবং যথাযথ নথিপত্র রাখবে হবে।

ii) নির্ধারিত বয়ান অনুযায়ী নিরাপত্তা প্রতিবেদন (Safety Reports) জমা দিতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ে নবীকরণ করাতে হবে।

iii) কোনো **বড় দুর্ঘটনা** (Major Accident) ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে হবে।

iv) নির্দিষ্ট বয়ানমাফিক **আভ্যন্তরীণ আপৎকালীন পরিকল্পনা** (On Site Emergency Plan) পেশ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে থাকবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ।

v) দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ বা অন্য ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (যেমন চিফ ইনস্পেক্টর অফ ফ্যাক্টরিজ) শিল্প কারখানার চারপাশের এলাকার জন্য আপৎকালীন জরুরি পরিকল্পনা (Off-site Emergency Plan) তৈরি করবেন। ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর বা জেলা আপৎকালীন কর্তৃপক্ষ (District Emergency Authority) একাজে সাহায্য ও পরামর্শ দিতে পারবেন।

☐ **পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়ন** (Environmental Impact Assesment) সাপেক্ষে বিপজ্জনক বর্জ্য ফেলার জায়গা চিহ্নত করা ও ঘোষণার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। প্রতিটি চিহ্নিত জায়গার নির্দিষ্ট অবস্থান এবং ফেলে দেওয়া বর্জ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ ইত্যাদি সমস্ত তথ্য সরকারকে তৈরি রাখতে হবে। ঘোষণা করতে হবে, এইসব জায়গায় বর্জ্য ফেলার জন্য আগাম অনুমোদন নিতে হবে। শিল্প সংস্থার নিয়ন্ত্রণে এরকম জায়গা রাখার জন্যও অনুমোদন নিতে হবে এবং তাঁদেরকে সমস্ত তথ্য জানাতে হবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদকে। বর্জ্য ফেলার জায়গায় বা বর্জ্য পরিবহণের সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তা সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

☐ পরিবেশ আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিনিয়ম, আদেশ নির্দেশ (Acts, Rules, Orders, Directions) লঙ্ঘন করলে ভারপ্রাপ্ত যে কোনো পদাধিকারী ব্যক্তি এমনকি কোম্পানিও অভিযুক্ত হতে পারবে। অবশ্য অপকর্মটি অজ্ঞাতসারে বা সর্বাত্মক প্রয়াস সত্বেও ঘটে গেছে বলে প্রমাণ হলে—শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে না।

☐ কেন্দ্রীয় সরকার বা ভারপ্রাপ্ত অফিসার বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের মতো বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষই কেবল মামলা দায়ের করতে পারবেন। (কোন্ আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে তা পরিবেশ আইনে উল্লেখ করা হয় নি।) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো সিভিল কোর্টেই মামলা আনা যাবে।...দোষী প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ পাঁচবছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় সাজাই হতে পারে। প্রথমবার দোষী সাব্যস্ত হবার পরও যদি অনুরূপ অপরাধ অব্যাহত থাকে তবে অতিরিক্ত প্রতিদিনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। দোষী প্রমাণিত হবার পরও এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপরাধটি চলতে থাকলে সর্বোচ্চ সাতবছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। (বর্ধিত অর্থদণ্ডের উল্লেখ নেই। কারাদণ্ডের ন্যূনতম কোন মেয়াদের কথাও এখানে আর বলা হয়নি।)

☐ জল ও বায়ু আইনের মতো পরিবেশ আইনেও বলা হয়েছে যে, অন্য কোনো আইনে যদি সংশ্লিষ্ট অপরাধটি বিচারযোগ্য হয়, তবে সেই অন্য আইনই প্রযুক্ত হবে। তবে অন্য কোনো আইন পরিবেশ আইন প্রয়োগে অন্তরায় হতে পারবে না।

জনদায় বীমা আইন অনুযায়ী :

☐ বিজ্ঞাপিত 179 টি বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ নিয়ে যারা কাজ-কারবারে লিপ্ত, তাদের সকলকেই উপযুক্ত মূল্যের বীমা পলিসি করতে হবে এবং সময়মতো তা নবীকরণ করতে হবে। এছাড়াও বীমার প্রিমিয়ামের সমপরিমাণ অর্থ জমা দিতে হবে 'পরিবেশ ত্রাণ তহবিলে' (Environment Relief Fund)। বীমাকারী সংস্থাই এ টাকা জমা রাখবে। উর্ধ্বসীমা 50 কোটি টাকা সাপেক্ষে বীমার পলিসির পরিমাণ অন্ততপক্ষে কারবারের বিনিয়োগের (paid up capital) সমমূল্যের হতে হবে।

☐ কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার অধীনস্থ বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের কারবারীরা বীমা করার দায়-থেকে বিশেষছাড় পেতে পারে (কেন্দ্রীয় সরকার-দ্বারা)। কিন্তু তাঁদেরকেও পরিবেশ ত্রাণ তহবিলে অর্থ জমা রাখতে হবে স্টেট-ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনো জাতীয়-ব্যাঙ্কে। বীমাপলিসির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবেন।

☐ জেলার কালেক্টররাই পরিবেশ-ত্রাণ দেবার বিষয়টি দেখবেন। ত্রাণের বিলিবন্টনও তাদের মাধ্যমেই হবে। কোনো একটি দুর্ঘটনায় মোট ত্রাণের পরিমাণ 5 কোটি টাকার বেশি হবে না।

☐ যারা এই আইনের আওতায় পড়েন অথচ বীমা করছেন না বা ত্রাণ তহবিলে অর্থ জমাচ্ছেন না, তাদের বিরুদ্ধে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে মামলা আনা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার বা ভারপ্রাপ্ত সংস্থা/অফিসারই শুধু এই মামলা করতে পারবেন।

☐ দোষী প্রমাণিত হলে দেড় থেকে ছয় বছর কারাবাস বা কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। দ্বিতীয় ও পরবর্তী অপরাধের ক্ষেত্রে দুই থেকে সাতবছর পর্যন্ত কারাবাস এবং কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে। তবে অজান্তে বা সর্বপ্রকার প্রয়াস সত্ত্বেও অপরাধটি ঘটে গেছে প্রমাণ হলে সেটি আর শাস্তিযোগ্য থাকবে না।

আইনী প্রক্রিয়ায় নাগরিক অধিকার ও অংশগ্রহণের সুযোগ

এক : পরিবেশ আইনের অধীনে ঘোষিত বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের শিল্পোৎপাদন, মজুত ও আমদানি সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম 1989-এর 15 নং রুলে বলা হয়েছে—**যে কোনো শিল্পকারখানায় কোনো বড় ধরণের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকলে শিল্প কর্তৃপক্ষ সরাসরি অথবা জেলা আপৎকালীন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজনকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনাজনিত বিপদের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত করবেন। এবং সেই সঙ্গে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির কথাও জানাবেন। দুর্ঘটনা ঘটলে কি কি করা উচিত বা কি কি করা উচিত নয় তাও জানাতে হবে।** নতুন কারখানার ক্ষেত্রে কাজ শুরু করার অন্তত 90 দিন আগে, আর পুরনো কারখানার ক্ষেত্রে বিধিনিয়ম চালু হবার 90 দিনের মধ্যে একাজ করতে হবে।

দুই : আলোচ্য চারটি আইনেই সংস্থান আছে—যে কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট ফরমের নির্দিষ্ট বয়ান অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ ও আদালতে মামলা দায়ের করার ইচ্ছার কথা জানাতে পারেন। চিঠির সঙ্গে কিছু প্রমাণও দাখিল করতে হবে। রেজিস্ট্রি ডাকে প্রাপ্তি স্বীকার কার্ড সহ পাঠানো চিঠি সংশ্লিষ্ট অফিসে পৌঁছনোর অন্তত 60 দিন পরে তিনি বা তাঁরা আদালতে যেতে পারবেন। পরিবেশ আইন ও জনদায় বীমা আইনের বক্তব্য এখানেই শেষ হয়েছে (ধারা 19 ও 18)। কিন্তু জল ও বায়ু আইনে (যথাক্রমে 42 ও 43 ধারা) আরও বলা হয়েছে যে, **কেউ দূষণ সংক্রান্ত মামলা করলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ মামলার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সমস্ত রিপোর্ট ওই ব্যক্তির নাগালে আনবেন** (shall make available)। সঙ্গে এও যোগ করা হয়েছে যে **পর্যদের বিচারে**

একাজ যদি জনস্বার্থবিরোধী হয় তবে পর্ষদ ওইসব রিপোর্ট নাও দিতে পারেন।

তিন : বায়ু আইন (51 ধারা) অনুযায়ী রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যেসব ক্ষেত্রে গ্যাসীয় বর্জ্য ছাড়ার অনুমতি দেবেন, ছাড়ের মাত্রা বা অন্যান্য সমস্ত শর্তাদি-সহ সেগুলির **একটি তালিকা** (Register) **পর্ষদের কাছে তৈরি থাকবে। আগ্রহী বা দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত যে কোনো ব্যক্তি বা ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষে অন্য কেউ পর্ষদের অফিসে ওই তালিকা পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন** (open to inspection)। জল আইনেও এই সংস্থান আছে উপধারা হিসেবে [25 (6)]। পরিবেশ আইনে অনুরূপ কোন সংস্থান নেই।

চার : জল আইন অনুযায়ী (ধারা 46) একবার দোষী সাব্যস্ত হবার পর কোনো ব্যক্তি যদি আবার অনুরূপ দোষে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট কোর্ট তথা বিচারক দোষীর নাম, বাড়ির ঠিকানা, অপরাধের প্রকৃতি ও সাজার বিবরণ সংবাদপত্রে বা অন্য কোনোভাবে ঘোষণার নির্দেশ দিতে পারেন। আনুষঙ্গিক খরচ দোষীকেই বহন করতে হবে।...বায়ু, পরিবেশ বা বীমা আইনে এই সংস্থান অনুপস্থিত।

পাঁচ : পরিবেশের ওপর প্রভাব মূল্যায়নে প্রকল্পের কাছাকাছি মানুষজন এবং/অথবা ওই এলাকার পরিবেশ সংগঠনের মতামত যাচাই-এর কথা বলা হয়েছে 1994-এর সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে। এর জন্য অন্তত 30 দিন আগে দুটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসভা করে মতামত জানার ব্যবস্থা করা হতে পারে। **ছাড়পত্র পাওয়া শিল্প/প্রকল্পের পরিবেশ মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা রিপোর্টের সারাংশ, জনস্বার্থ বিবেচনা সাপেক্ষে, জনসাধারণ দেখতে পারবেন।**

ছয় : (ক) জনদায়িত্ব বীমা আইন অনুযায়ী দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ প্রত্যেকে চিকিৎসা বাবদ সর্বোচ্চ সাড়ে বারো হাজার টাকা, মৃত্যু বা স্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়লে চিকিৎসা বরাদ্দের অতিরিক্ত পঁচিশ হাজার টাকা ত্রাণ পাবার অধিকারী। সাময়িকভাবে উপার্জনে অক্ষম হলেও তিন মাস পর্যন্ত মাসিক এক হাজার টাকা এবং ব্যক্তি সম্পত্তির ক্ষতির বেলায় সর্বোচ্চ ছ-হাজার টাকা আশু ত্রাণ দাবি করা যাবে। আংশিক স্থায়ী অক্ষমতার জন্য আংশিক ত্রাণ প্রাপ্য হবে।

দুর্ঘটনার পাঁচ বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট বয়ানে জেলা কালেক্টরের কাছে ত্রাণের আবেদন করতে হবে। আবেদনগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কালেক্টর কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিভিল কোর্টের ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবেন এবং তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে। এই ত্রাণ পাওয়ার জন্য কেন দুর্ঘটনা বা কে দায়ী এসব প্রমাণের কোনো দায় থাকবে না আবেদনকারীর। পরিবেশ ত্রাণ তহবিল ও বীমার টাকা থেকে ত্রাণ দেওয়া হবে। (খ) জেলা কালেক্টর (জেলা শাসক) 'পরিবেশ ত্রাণ' সম্পর্কিত সমস্ত তথ্যের (দরখাস্তকারী, ত্রাণ প্রাপক, টাকার পরিমাণ ইত্যাদি) রেকর্ড রাখবেন এবং সমস্ত কাজের দিন জনসাধারণ তা দেখতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (concerned person) চাইলে ওই নথি বা তার অংশবিশেষের সার্টিফায়েড কপি পেতে পারবেন এবং আদালতে তা মূল নথি বলে গণ্য হবে। (গ) জনদায় বীমা আইনে ত্রাণ-প্রাপকরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবী করে আদালতে যেতে পারবেন। ☐

রবীন মজুমদার

রোগীদের অধিকার : *পৃষ্ঠা 4-এর পর*

কত টাকা খরচ হতে পারে এই রকম একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা। এর ভিত্তিতে রোগী/রোগীর অভিভাবক ওয়াকিবহাল হলো, ওষুধ, চিকিৎসা-পদ্ধতি, সময়, খরচ সম্পর্কে ধারণা হলো। এই বিষয়টা দুদিন আলোচনা হয় *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* পত্রিকার দপ্তরে। কয়েকটা বিষয় জানা যায়। বিদেশে রোগীদের অধিকার লিখিত রয়েছে—সেসব যোগাড় করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতির আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট রোগীদের সরকারি হাসপাতালে ভর্তির অধিকার ঘোষণা করেছে। আমরা চাইছি ভর্তির পর চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কিত রোগীদের অধিকার।

আমরা অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ করে চিকিৎসকদের সংগঠনের কাছে পাঠাব, এ-বিষয়ে তাদের মতামত চাইব। বন্ধু চিকিৎসকদের বলব তারা সংগঠনের ভিতর আলোচনা করুন। স্বাস্থ্যব্যবস্থা চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে যারা নানা ধরণের কাজ করছেন তাদের সঙ্গে অলোচনা করব। সবার মিলিত উদ্যোগে রোগীদের অধিকার পাওয়া যাবে। কমখরচে চিকিৎসা হবে। চিকিৎসক রোগী সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা, বিশ্বাস নিয়ে—একের ওপর অন্যের অধিকার, ক্ষমতার প্রকাশ নিয়ে নয়। সুস্থ চিকিৎসা-ব্যবস্থায় রোগীরা চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হবেন। ☐

রিপোর্ট

শহুরে আবর্জনা ও হাসপাতালের বর্জ্য

ভারতবর্ষে নগরায়নের চাকা গড়গড়িয়ে চলেছে। শহরকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে মানুষের জীবন। তার একটা অবশ্যম্ভাবী ফল হলো শহুরে জঞ্জালের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। পুরসভার গাড়ি বা কর্মীরা জঞ্জাল নিয়ে চলে যায়। আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যাই—জঞ্জাল সাফাই হয়ে গেল বলে। একটু ভেবেও বোধ হয় দেখি না—এসব জঞ্জালে কি থাকে, কোথা থেকে আসে—বাজার, না বাড়ি, না হাসপাতাল। তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। কোথায়ই বা যায় এ সব জঞ্জাল আর তারপরই বা এ সবের কি গতি হয়, তা নিয়েও আমাদের কোনো চিন্তা থাকে না।

অথচ নগর কলকাতায় সাধারণ জঞ্জালের সঙ্গেই মিশে থাকে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমের বর্জ্য, যার মধ্যে থাকতেই পারে নানারকম সংক্রামক রোগের জীবাণু। এ সব বর্জ্য, শহুরে অন্যান্য বর্জ্যের সাথে এক সঙ্গেই স্তূপীকৃত হচ্ছে ধাপায়।

শহুরে বর্জ্যের সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে গত 25 ও 26 নভেম্বর '97 একটা আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হলো কলকাতায় সল্টলেকের রিজিওনাল অকুপেশানাল হেলথ সেন্টার (আর. ও. এইচ. সি) (পূর্বাঞ্চল) (আই. সি. এম. আর)-এর নবনির্মিত ভবনে। আর. ও. এইচ. সি ছাড়াও এই সেমিনার ঢঙের আলোচনাচক্রে উদ্যোক্তা হিসেবে ছিল পার্টিসিপেটরি রিসার্চ ইন এশিয়া (PRIA, দিল্লি) এবং ডাইরেক্ট ইনিসিয়েটিভ ফর হেলথ অ্যান্ড সোস্যাল অ্যাকশন (DISHA, কলকাতা) নামের দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO) আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম—'Urban Waste Management System with Special Reference to Hospital Waste'.।

দুদিনের সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যেমন ছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দির, (Bose Institute), অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্‌থ (AIIH&PH), কর্মচারী রাজ্যবীমা সংস্থা (ESI Scheme) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতিনিধিরা, তেমনি ছিলেন অনেকগুলি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের (NGO) প্রতিনিধিরা।

ওই আলোচনার থেকে আমরা দুটো ESI হাসপাতালের বর্জ্য সংক্রান্ত একটা সমীক্ষায় জানতে পারি যে, হাসপাতালের প্রায় 80 শতাংশ বর্জ্যই হলো সাধারণত ফেলে দেওয়া খাবার বা খাবার তৈরির উপকরণের অবশিষ্টাংশ বা কাগজ। আর সংক্রামক ব্যাধি হতে পারে এমন বর্জ্যের পরিমাণ 14 থেকে 16 শতাংশ এবং এর মধ্যেই পি ভি সি বা প্লাস্টিকও আছে। অর্থাৎ এই সবচেয়ে ক্ষতিকারক প্রায় 15 শতাংশ র্বজ্য যদি আগেই আলাদা করা যায়, তবে পুরো র্বজ্যটাই আর এত ক্ষতিকারক থাকে না। এ-ব্যাপারে ভারত সরকার 1995 সালে একটি খসড়া নিয়মাবলি তৈরি করেছিল মেডিক্যাল আবর্জনার সদ্‌গতির জন্য [The Bio-medical wastes (Management and Handling) Rules, 1995, Ministry of Environment and Forests, G.O.I. April, 1995 Draft Rules]। এই রুল-এ হাসপাতালের বর্জ্যকে 14 রকম ভাগে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে। এই ভাগগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা নেই। মিলেমিশে গেছে। তার থেকেও বড় কথা হলো এগুলোকে যদি আলাদা আলাদাভাবে জমানো বা বিহিত করার চেষ্টা করতে হয় তো চোদ্দো রকম কাজে হাত দিতে হয় একইসঙ্গে। এ-ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র পরামর্শ অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য— তারা হাসপাতাল বর্জ্যকে মোটামুটি ছটি ভাগে পৃথক করার কথা বলছে।

সবচেয়ে আশার ব্যাপার হলো অন্তত কিছু কিছু মানুষ প্রশাসনে থেকেও এই দুষণ নিয়ে অনেক মাথা ঘামাচ্ছেন এবং সাধ্যমতো তা রোধে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই প্রতিফলন ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের অন্তত একটা ESI হাসপাতালে। সেখানে হাসপাতালের বর্জ্যকে হাসপাতালেই আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে তা সরিয়ে নিয়ে যাবার আগেই—যাতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ সংক্রামক জীবাণুবাহী বর্জ্য, সিংহভাগ সাধারণ বর্জ্যের সবটাকেই দূষিত না করতে পারে।

এই আলোচনাচক্রের থেকে আরও জানা যায় যে, কলকাতার AIIH&PH তাদের একটা সমীক্ষা রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ

সরকারকে দিয়েছে। যেখানে খুব সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব আছে, এই হাসপাতালের বর্জ্যকে সংগ্রহ ও সরিয়ে ফেলা বা বিহিত করার ব্যাপারে। সেই রিপোর্টে ধাপাতে যেভাবে ময়লা ও আবর্জনা স্তূপীকৃত করা হচ্ছে বর্তমানে তার কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ আছে।

14 ডিসেম্বর '97 সংবাদ মাধ্যমে জানা গেল কলকাতা পুরসভা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে যে, হাসপাতাল, নার্সিংহোম ও রসায়নাগার (Pathological Laboratory) থেকে বর্জ্য পদার্থ পুরসভা একদম আলাদাভাবেই সংগ্রহ করবে আগামী ফেব্রুয়ারি '98 থেকে। এরজন্য তারা আলাদা প্যাকেটের ব্যবস্থাও করবে। কোন্ নিয়মে আলাদা করবে তা অবশ্য জানা যায় নি। তবে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করবে বলে শোনা গেছে। আরও জানা গেল যে, ধাপাতে এগুলো চুল্লিতে পোড়ানো হবে এবং ছাইটাকে এমনভাবে রাখা হবে যাতে পানীয় জলের সঙ্গে না মিশে যায়। উদ্যোগ সাধু সন্দেহ নেই। কিন্তু মুশকিল হলো এই কাজটাকে ঠিকঠিক চালানো নিয়ে। যেমন হাসপাতাল থেকে আদৌ ঠিকভাবে সব আলাদা প্যাকেট করা হবে কি-না, পোড়াবার সময় পিভিসি বাদ দিয়ে করা হবে কি-না নাকি আলাদা সংগ্রহের পর ধাপাতে গিয়ে আবার সব অন্য বর্জ্যের সঙ্গেই মাখামাখি হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত DISHA-র ধাপা অঞ্চলের পানীয় জল ও পুকুরের জল নিয়ে সমীক্ষা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ওই অঞ্চলের দশটি নলকূপের জলের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সব নলকূপের জলেই কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। সবচেয়ে বেশি রয়েছে 170/100 মি.লি. এবং সবচেয়ে কম রয়েছে 2/100 মি.লি.। অর্থাৎ পানীয় জলে যদি পরপর তিনটে নমুনায় কোনো একটিতে মাত্র একটি কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়াও পাওয়া যায় তবে তা পানের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, কারণ তা থেকে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল। এই নলকূপের জলে ধাতব বা খনিজ দ্রব্য অন্যান্য গুণাগুণের বিচারে পানযোগ্য নয়, বলা যাবে না। আর তিনটি পুকুরের জলের মধ্যে একটি পুকুরের জল একদম পচা নর্দমার জলের সঙ্গে তুলনীয়, যেখানে D.O. (Dissolved Oxygen) শূন্য এবং ক্ষারত্ব 8.26 (PH)। অর্থাৎ ধাপা অঞ্চলে শহরের বর্জ্যের সঙ্গে সবকিছুর মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে, এটা বলাই যায়। এছাড়া ওই অঞ্চলে স্বাস্থ্য সমীক্ষাও হয়েছে। যার ফলাফল দেখলে চমকে যেতে হয়। 73 শতাংশ কুড়োনিদের পিঠে ব্যথা আর 61 শতাংশ কুড়োনিদের হয় পেটে না হয় বুকে ব্যথা। এছাড়াও এক বছরে এঁদের মধ্যে 46 শতাংশ জন্ডিসে ভুগেছে এবং 77 শতাংশ কুকুর বা ইঁদুরের কামড় খেয়েছে। আর কাটা-ছেঁড়া, পাতলা পায়খানা বা জ্বর-সর্দিকাশি তো আছেই।

ওই আলোচনাচক্রে সরকারি আইন ও নিয়মাবলীর হাস্যকর দিক নিয়েও আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989-কে উল্লেখ করা হয়। যেখানে বর্জ্যের সঙ্গে মেশানো বিভিন্ন রাসায়নিকের সামগ্রিক পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে কিন্তু আনুপাতিক হার বলা নেই। যেমন যদি পাঁচ কেজি আর্সেনিককে বর্জ্যের সঙ্গে ফেলাটা মারাত্মক দূষণ বলে ধরা হয় তখন কিন্তু বর্জ্যের পরিমাণ একশো কেজি না একশো টন ধরা হবে না। অথচ পাঁচ কেজির অনেক বেশি আর্সেনিক তরল বর্জ্যের সাথে কারখানা থেকে ফেলে দেওয়া যায় 'Water Act'-এর ফাঁক দিয়ে। আর সরকারি আইন যে কাগজে কলমেই তার চিত্রটা ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে যখন এই বর্জ্য থেকে পুনর্ব্যবহার্য (Recycling) জিনিস তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়।

টীকা

১ সেই আভাসের ওপর ভিত্তি করে একটা ভাগ ওই সভাতে রাখা হয়। সেগুলি নীচে দেওয়া হলো।

এক : সাধারণ : রান্না ঘরের বর্জ্য ও রান্না খাবারের অবশিষ্টাংশ এবং ফেলে দেওয়া কাগজ।

দুই : রাসায়নিক ও ওষুধ সংক্রান্ত : নানা ধরণের প্যাকেট, ব্যাটারি, নষ্ট হওয়া রাসায়নিক, নষ্ট হওয়া ঔষুধ ইত্যাদি।

তিন : ধারালো : ইনেজকশনের সূঁচ, ভাঙা কাচ বা ব্লেড এবং ধারালো যন্ত্রপাতি।

চার : মল, মূত্র, রক্ত ইত্যাদির বর্জ্য : মানুষের শরীরের বর্জ্য, রক্ত, মানুষের শরীরের কেটে ফেলা যে কোনো অংশ, রসায়নাগারের জীবাণু পরীক্ষা করার মাধ্যম অথবা এদের সংস্পর্শে আসা যে কোনো গজ, ব্যান্ডেজ কাপড়।

পাঁচ : সংক্রামক : চার নম্বরে উল্লিখিত সামগ্রী যদি HIV/AIDS, Hepatitis B ও Tuberculosis (থুতু) রোগীর হয়।।

ছয় : অন্যান্য : এক্স-রে প্লেট বা বিভিন্ন ব্যবহার্য পাত্র, নষ্ট হওয়া গ্যাস সিলিন্ডার বা নষ্ট হওয়া বেড ও আলমারি।

এই ভাগ করাটার সবচেয়ে সুবিধে হলো বিভিন্ন রকমের বর্জ্য বিভিন্ন উপায়ে নিরসন করা যায়।

স্বপন দাস

পুস্তক পরিচিতি

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও উৎস সন্ধানে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জোসেফ নীডহাম

প্রয়াত ব্রিটিশ জীবনবিজ্ঞানী ও চীন বিশারদ জোসেফ নীডহামের (1900-1995) জীবন ও কর্ম নিয়ে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে যে আলোচনা চক্র বসেছিল, তার অংশগ্রহণকারীদের রচনাবলীর সঙ্গে আরো কিছু সংযোজন করে 1997 সালে এশিয়াটিক সোসাইটি যে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তার সম্পাদনায় ছিলেন অধ্যাপক সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় ও অমিতাভ ঘোষ। বইটি বাঁধানো, 204 পৃষ্ঠার, মূল্য 204 টাকা, নাম *The Life and Works of Joseph Needham*। এই গ্রন্থের 14 জন বাঙালি প্রবন্ধকারের পরিচিতি গ্রন্থশেষে দেওয়া আছে। এতে মরিস গোল্ডস্মিথের 20 পৃষ্ঠার 1976 সালের একটি রচনার ('Joseph Needham, Honorary Taoist') সংযোজনটি আকর্ষণীয়। সুশীলবাবুর প্রাক কথনটিও যথাযথ।

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা ও জোসেফ নীডহাম

ভারতীয় সমাজ ও বিজ্ঞানের জন্য জোসেফ নীডহাম এবং তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা (SWF) ও *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* পত্রিকার সঙ্গে জোসেফ নীডহামের এক ধরণের আত্মিক যোগ ছিল। 'Association of Scientific Workers of India' (ASWI, New Delhi) শুরু হয় স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে মেঘনাদ সাহা, জবাহরলাল নেহরু প্রভৃতিদের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাঁরা আবার অনুপ্রাণিত হন জে বি এস হলডেন, জে ডি বর্নাল, জোসেফ নীডহাম, লেডি হগবেন, পি এম ব্ল্যাকেট প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রিটিশ বামপন্থীদের জীবন ও কর্ম থেকে। ASWI অনুরূপ ব্রিটিশ সংস্থা ও World Federation of Scientific Workers (WFSW) এর সাথে সম্পর্কিত ছিল, আছেও। SWF-এর পথ নিজের।

বায়োকেমিস্ট নীডহাম

আলোচনা গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, অবশ্যই সাধারণ শিক্ষিত মানুষের জন্য, জে জে ঘোষ এবং তুষার চক্রবর্তী। নীডহামের 1932 সালে তিন খণ্ডের *Chemical Embryology* গ্রন্থ বায়োকেমিস্ট্রি বিজ্ঞানে মূল্যবান অবদান। নীডহাম গবেষণা শুরু করেন বিখ্যাত স্যার গাউল্যান্ড হপকিন্সের ল্যাবরেটরিতে। গবেষণায় নীডহাম নতুন যুগের জীবন বিজ্ঞানের আভাষ আনেন। আগের যুগের "কোথায় এবং কখন?" এর সঙ্গে তিনি সংযোজন করলেন—"কেন এবং কিভাবে?" জগজ্জীবন ঘোষের মূল্যবান রচনায় ওই সময়কার ব্রিটেনের অনুপ্রেরণাময় পরিবেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাবে। সেই সময় নীডহাম তাঁর আশপাশে যাঁদের পেয়েছিলেন তাঁদের নামের তালিকা আলিয়ে দেখবার মতো। যথা—স্যার ফ্রেডারিক গাউল্যান্ড হপকিন্স, জে বি এস হলডেন, ডরোথি নীডহাম (পরে জোসেফের স্ত্রী এবং FRS), জে ডি বার্নাল, অ্যালবার্ট সেন্ট জর্গি, রবার্ট হিল, হান্স ক্রেবস্ প্রভৃতি। আর ভারত থেকে ছিলেন—বীরেশচন্দ্র গুহ, কমলা ভগবৎ (সোহানি), এম এন রায়, কে সি সেন, ভি সুব্রহ্মণিয়াম, এম শ্রীনিবাসিয়া প্রভৃতি।

1931 সালের "Science at the Cross Roads"

এশিয়াটিক সোসাইটি বিজ্ঞানের ইতিহাসের ওপর গবেষণা ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানের ইতিহাস অনাদৃত, অবহেলিত। ড. কালিদাস নাগ আক্ষেপ করতেন — 'আমাদের বিজ্ঞানীরা ইতিহাস জানেন না, আর ঐতিহাসিকরা বিজ্ঞান জানেন না'। 1962 সালে এশিয়াটিক সোসাইটি জোসেফ নীডহামকে স্যার উইলিয়াম জোনস্ পদক দেন। বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সমরেন্দ্রনাথ সেন নীডহামের পত্রটি পাঠ করে দেন এবং পদকটি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

নানাকারণে 1931 সালে তরুণ নীডহামের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। অর্থনৈতিক সঙ্কট, জার্মানিতে হিটলারের আরোহণ এবং সর্বোপরি সে বছরই (29 June-3 July) লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মিলন।

তার সভাপতি বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চার্লস সিংগার নীডহামকে সম্মিলনের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই সম্মিলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ভারী ওজনের সোভিয়েত প্রতিনিধিদল। তার নেতৃত্ব দেন বিখ্যাত তাত্ত্বিক ও পণ্ডিত এন আই বুখারিন। (1938 সালে বুখারিন স্তালিন কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন)। সোভিয়েত প্রতিনিধি দলে আরো ছিলেন A F Jaffe (Physiologist), I Rubinstein (Economist), B Zavadosky (Physiologist), E Kolman (Mathematician ; 84 বছরের এই Academician, যিনি ছিলেন লেনিনের দীর্ঘদিনের সহযোগী, তাঁর 58 বছরের CPSU-এর সদস্য কার্ড ব্রেজনেভকে ফিরিয়ে দিয়ে 1976 সালে সুইডেনে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন) N I Vavilov (Plant Physiologist), VF Mitkevitch (Electrical Engineer) এবং Borris Hessen (Theoretical Physicist)। হেসেনের পেপার *The Social and Economic Roots of Newton's Principia* তরুণ বিজ্ঞানী মহলে বিতর্কের ঝড় তোলে। বার্নালের রচনাবলীতেও এই বিতর্ক কিছুটা আলোচিত। হেসেনের পেপার নীডহামকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে যার চরম ফলশ্রুতি নীডহামের গবেষণাগার থেকে ক্রমে সরে যাওয়া এবং চীন বিশারদ হয়ে *Science and Civilization in China*-র প্রকাশ।

বহির্বাদী নীডহাম

বিজ্ঞানের ইতিহাসের গবেষকদের মধ্যে একটা মৌলিক বিতর্ক বহুদিন ধরেই চলে আসছে। তা হলো বহির্বাদী ও অন্তর্বাদী বা Externalist ও Internalist বিতর্ক। অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রধান নিয়ন্ত্রক সামাজিক প্রয়োজন, বাইরের সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ, না তার আভ্যন্তরীণ গতি? মরিস গোল্ডস্মিথের রচনার অংশবিশেষ উল্লেখ্য :

> The debate between "externalists" (those who feel they can descry profound influences of social structure and social change upon science and scientific thought) and "internalists" (those who prefer to think only in terms of an internal logic of development powered by intellectual giants of mysterious origin) still goes on.

নীডহাম বহির্বাদী হয়ে পড়েন। তাঁর জীবনভর বিরাট কর্মকাণ্ডের প্রেরণা আসে এক প্রশ্ন থেকে : প্রাচ্য বিজ্ঞান থেকে ইওরোপীয় বিজ্ঞান প্রায় 1400 বছর পিছিয়ে থেকেও কেন 1500-1700 খ্রিস্টাব্দে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম দিতে পারল, চীন বা ভারত পারল না? কোন্ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্য চীন বা ভারতে বিজ্ঞানের রূপান্তর বা মিউটেশনে বাধা হয়ে পড়েছিল যার জন্যে চীন বা ভারত কোনো কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটনের জন্ম দিতে পারল না, কিন্তু ইওরোপ পারল? চীনের কৃষিকার্য অত্যন্ত পুরনো ও উন্নত হওয়া সত্ত্বেও হার্টফোর্ডশায়ারের ভুবনখ্যাত রথামস্টেডের মতো কৃষিগবেষণা ফার্ম চীনে হলো না, ব্রিটেনে হলো?

এইসব প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে তিনি তাঁর কিছু বায়োকেমিস্ট্রির চীনা গবেষকের কাছ থেকে চীনা ভাষা, তার ইতিহাস, তার বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাথমিক পাঠ নেন এবং বহু বছর চীনে থেকে তার আনাচে-কানাচে অনুসন্ধান করে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সিনোলজিস্ট হয়ে ওঠেন। নীডহাম চীনে আজও শ্রদ্ধেয় একটি নাম।

আলোচ্য গ্রন্থে দীপঙ্কর চ্যাটার্জি, শান্তনু চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁদের মতো করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে আধুনিক বিজ্ঞান ইওরোপে আবির্ভূত হলেও তার ভিত্তিভূমি বহু শতাব্দী ধরে প্রাচ্য দেশসমূহে তৈরি হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানকে 'ইওরোপীয় বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করা বাস্তবসঙ্গত নয়। নীডহাম ইওরোপের অনেকের আধুনিক বিজ্ঞানকে 'ইওরোপীয় বিজ্ঞান' বলার মধ্যে উগ্র জাত্যাভিমান ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাই দেখেছেন। শান্তনু চক্রবর্তী বিজ্ঞান বিপ্লবোত্তর ইওরোপীয় বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন এইভাবে — পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল তথ্য আহরণ ও গণিতের সমন্বয় সাধন। বিখ্যাত জ্যাকব ব্রনোস্কির একটি উদ্‌ধৃতি দিয়ে দীপঙ্কর চ্যাটার্জি ইওরোপীয় বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচ্য পুরাতন বিজ্ঞানের পার্থক্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। তার উদ্‌ধৃতি :

> কোনো প্রাণীর বিবর্তনের পথে কখনও এমন সময় আসে যখন প্রজাতিটি একটি নতুন মৌলিক পদক্ষেপ নেয়, প্রজাতিটির জীন ভাণ্ডারে নতুন একটি জীন সংযোজিত হয়, তখন সেই মুহূর্ত থেকে সে একটি নবজন্ম পায়— যেমন, জলতল থেকে ভূমণ্ডলে উঠে এসে বসতি বিস্তার করে। আমার মনে হয় মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিজ্ঞান বিপ্লবে অনুরূপ ব্যাপরাই ঘটেছে। এই বাস্তব সত্য আমাদের মানতেই হবে।

একথা মানলেও আধুনিক বিজ্ঞানে প্রাচ্য অবদান অস্বীকার করা সত্যের বিষম অপলাপ নয় কি?

SCC

ইওরোপ যখন অন্ধকারে ছিল তখন চীন বিশ্ববিজ্ঞানে কি দিয়েছিল তার দিকে তাকালে জাত্যাভিমানী ইওরোপীয় প্রগলভতা কমবে। কিছু দৃষ্টান্ত — লোহা ও ইস্পাত প্রযুক্তি, লোহার ঝুলন্ত সেতু, চীনামাটির প্রযুক্তি, চেন ও গীয়ার, সরলরৈখিক গতির আবর্তগতিতে রূপান্তর, যান্ত্রিক ঘড়ি, কাগজ, মুদ্রণ প্রযুক্তি, বারুদ, কামান, বোমা, চুম্বকবিজ্ঞান, কম্পাস, গ্রহণ ধূমকেতু, নোভা সুপার-নোভার তথ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি।

বহু চীনা পণ্ডিতের সাহায্যে জোসেফ নীডহাম চৈনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার যে 'ম্যাগনাম ওপাম' প্রণয়ন করেন সেই *Science and Civilisation in China* (SCC) এই শতাব্দীর অন্যতম বৃহত্তম গবেষণা কার্য যা এখন পর্যন্ত 16 খণ্ডে প্রকাশিত।

Science and Civilisation in China : Introductory Orientations (Vol 1)

History of Scientific Thought (Vol 2)

Mathematics and the Sciences of the Heavens and the Earth (Vol 3)

Physics and Physical Technology (2 Vols)

Chemistry and Chemical Technology (7 Vols)

Biology and Biological Technology (3 Vols)

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 1995 সাল পর্যন্ত 7 খণ্ড বেরিয়েছে।

নীডহামের গবেষণায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানের ইতিহাসও কিছু এসেছে। আলোচ্য গ্রন্থে নীডহামের সমগ্র রচনাবলীর (চার শতাধিক) তালিকা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির স্তর, তার গতি-প্রকৃতি যে সমাজের দার্শনিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কৃতিত্ব নীডহাম যথার্থভাবে পেলেও, এটাও উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না যে, আমাদের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর *History of Hindu Chemistry* (১ম সংস্করণ) গ্রন্থে তা অনেক আগেই দেখিয়েছেন। এই আলোচনা আলোচ্য পুস্তকে দেখিনি, যদিও প্রয়াত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সে-কথা বারবার বলেছেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ভারতের ওপর দেবীবাবুর গুরুত্বপূর্ণ কাজে—*History of Science and Technology in Ancient India* রচনার সময়ে জোসেফ নীডহাম সাহায্য করেছিলেন।

শুভেন্দু দাশগুপ্ত 'বাস্তবতা ও কল্পকথার বিরোধিতায় জ্ঞানব্রতী নীডহাম' নিবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, প্রাচ্য দেশীয়রা—বিশেষ করে ভারতীয়রা ইওরোপীয় প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগেন। আমাদের বিজ্ঞানের পাঠ্য বই রেফারেন্স বই সবেই দেখা যায় বিজ্ঞানের সবকিছুই ইওরোপ আমেরিকার দান, আমাদের কিছু নেই, ছিলও না। নীডহাম বাস্তব চিত্র উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কল্পকথাকে মানতে রাজি হন নি। বর্তমানের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বেশি বেশি করে প্রযুক্তি-মুখী হয়ে উঠেছে, যা দিয়ে উৎপন্ন হচ্ছে ভোগের সামগ্রী, সম্প্রসারিত হচ্ছে বাজার আর মুনাফা। প্রাচ্য-বিজ্ঞানে ধর্ম ও নৈতিকতা ছিল অনেক বেশি। বিজ্ঞানী নীডহামের উত্তরণ ঘটেছে বিজ্ঞানের দার্শনিক নীডহামে। গ্রীক বিজ্ঞানে তাত্ত্বিকতার দিকে ঝোঁক ছিল বেশি, চীনা বিজ্ঞানে প্রযুক্তির দিকে।

বেলা দত্তগুপ্তা 'জোসেফ নীডহাম : নবজাগরণের একক হোতা' নিবন্ধে আলোচনা করেছেন নীডহামের বহুমুখী প্রতিভার—বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, শিল্প, স্থাপত্য, পুরাতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতিতে। পাশ্চাত্য দেশে নিয়ন্ত্রিত প্রজননের মাধ্যমে উন্নততর মানব জাতি গঠনের ভ্রান্ত ও বিশ্রীতত্ত্ব ফ্রান্সি গ্যালটনের ইউজেনিকস তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন জোসেফ নীডহাম। আশীষ লাহিড়ী 'নীডহাম ও বার্নাল : বৈপরীত্যের বীক্ষণ' প্রবন্ধে এই শতাব্দীর দু'জন শক্তিধর সমাজমুখী বিজ্ঞানীর মানসিকতা ও কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক বিচার করবার প্রয়াসী হয়েছেন। 1960-এর দশকে মাও ৎসে তুঙ পরিচালিত বৃহৎ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মহান বাণীতে নীডহাম উল্লসিত হয়েছিলেন এবং তাকে তিনি মার্কসবাদে এক অনন্য-সাধারণ সংযোজন বলে মনে করতেন। তার মর্মবাণীর আহ্বান যথা— "লোভ ত্যাগ কর, নিজের সঙ্গে সংগ্রাম কর। মানুষকে বুঝতে হবে যে তার ভিতরে যে 'কু' আছে তার বিরুদ্ধেও তাকে সংগ্রাম করতে হবে," নীডহামকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

দীপঙ্কর চক্রবর্তীর 'ভারতবাসীর কাছে জোসেফ নীডহামের প্রাসঙ্গিকতা' ছোটো লেখায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রচার যেন একটু বেশি মনে হয়েছে। বৃটেনের ইঙ্গো-চীন মৈত্রী গোষ্ঠীর (SACU) (যার সভপতি ছিলেন নীডহাম) *ব্রডসীট* পত্রিকার সঙ্গে মর্শিদাবাদের *অনীক* পত্রিকার সহযোগিতার কথা বলেছেন। দীপঙ্করবাবু যথার্থভাবেই বলেছেন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কি

কি কারণে ইওরোপে নবজাগরণ এবং বণিকশ্রেণীর বণিক ও শিল্পপতি শ্রেণীতে পরিণত হওয়া সম্ভব হলো—ভারত বা চীনে হতে পারল না—বুদ্ধিজীবীদের তার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

নীডহাম এবং ধর্ম ও মার্কসবাদ

অরুণ কুমার বিশ্বাস তাঁর নীডহাম বন্দনায় দেখিয়েছেন জীবনযাত্রার বহুবিধ মাত্রা। বিজ্ঞান সব নয়, একটিমাত্র। ধর্ম, শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান সব মিলিয়েই সমগ্র মানুষ, সমগ্র সভ্যতা। নীডহামের ভাবনার আসনের ছিল তিনটি পাদ : Science, Spiritualism, Socialism। নীডহামের ধর্মীয় ধারণা প্রচলিত ধর্মীয় ধারণার থেকে ভিন্ন, তাঁর মার্কসবাদ প্রচলিত মার্কসবাদ থেকে ভিন্ন। এসব ব্যাপারে হলডেন বার্নালরা নীডহামের সঙ্গে সমমতাবলম্বী ছিলেন না।

মহাদেবপ্রসাদ সাহা, দিলীপকুমার সিনহা ও রমাতোষ সরকারের রচনাগুলি ছোটো। এ জন্যে হয়তো তাঁরা বেশী সময় দিতে পারেন নি।

নীডহাম মনে করতেন ধর্ম ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। যা সর্বত্র সর্বদা প্রতিক্রিয়াশীল ছিল না। ধর্মের অপপ্রয়োগ যাঁরা করেছেন, যাঁরা খ্রিস্টান হয়েও অখ্রিস্টানীয় কাজ করেছেন—যথা, 'ইনকুইজিশনে' বসতেন, 'উইচ হান্ট' করাতেন, ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছেন—তাদের বাইরেও ধর্মের প্রগতিশীল ও সৃজনশীল ভূমিকার কথা মার্কসবাদীদের মনে রাখতে বলেছেন। নীডহাম 'ধর্মের আফিম বিজ্ঞানের হ্যাসিস'-এর অর্থ অনুধাবন করার প্রচেষ্টা করেছেন। অলকা চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'তাওবাদ, তন্ত্র ও সিদ্ধ মতবাদ' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে ধর্মের কিছু প্রগতিশীল দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

মানুষ নীডহাম

নীডহামের ভেতর জ্ঞান ও কর্মের সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। 1952 সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উত্তর চীন ও কোরিয়াতে জীবাণুযুদ্ধ চালানোর অভিযোগ ওঠে, তখন নীডহামকে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কমিশনের সদস্য হিসারে চীনে অনুসন্ধানে যেতে হয়। লিখিত অনুসন্ধান বিবরণে অন্যদের সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে বলেন "তথ্য প্রমাণাদি থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আমেরিকা কোরিয়াতে জীবাণুযুদ্ধ চালিয়েছে।" আমেরিকা আকাশ থেকে বিষাক্ত মাকড়সা, এঁটেল পোকা, মশা, নীলমাছি, মস্তকহীন ইঁদুর জাতীয় প্রাণী উত্তর কোরিয়াতে ছেড়েছিল। এই সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য নীডহামকে অনেক লাঞ্ছনা সইতে হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় নীডহাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছিলেন। বিপ্লবোত্তর চীনের পুনর্গঠনেও নীডহাম অংশ নেন।

সব মিলিয়ে বইটা ভালো। উদ্যোক্তাদের দিক থেকে কোনো ত্রুটি আছে বলে মনে হয় না। এদেশের বর্তমান বাস্তব অবস্থায় এর থেকে আর কতটা বেশি হতে পারে? তবে পুস্তকের শিরোনামের সঙ্গে আরো একটু সঙ্গতিপূর্ণ হতো, অন্তত পাঠক উপকৃত হতো, যদি *SCC*-র একটি অতিসংক্ষিপ্তসার সংযোজন করা যেত। বহুপণ্ডিতই দুঃখ করে বলেছেন যে *SCC* referred হয়, পঠিত হয় না। একথা বললে, এটাও শুনতে হতে পারে পশ্চিমবাংলার কজন অধ্যাপক পি সি রায়ের *হিন্দু রসায়নের ইতিহাস*, সমরেন্দ্রনাথ সেনের *বিজ্ঞানের ইতিহাস* বা ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের *বিজ্ঞানের ইতিহাস* পড়েছেন? □

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

গ্রাহকদের প্রতি

যাদের গ্রাহক চাঁদা ডিসেম্বর 1996-এ শেষ হয়েছে তাদের কাছে অনুরোধ গ্রাহকপদ নবীকরণ করে নিন।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা 20.00 টাকা (সডাক)। টাকা পাঠাবার ঠিকানা :

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী P 252 লেকটাউন ব্লক A, কলকাতা 700 089

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী জানুয়ারি - মার্চ 1994 — অক্টোবর-ডিসেম্বর 1997 রচনাপঞ্জী

রচনা/লেখক	সংখ্যা/পৃষ্ঠা
অ	
অর্চনা মামলা : ধৈর্য সাহস এবং আত্মত্যাগের মূল্যে অর্জিত জয়/র.চ.	জা.-মা. '96/29
অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম (অ)/অ্যাশলে মন্টেগু [অনু. : রবীন চক্রবর্তী]	জু.-সে. '97/6
আ	
আই এম এফ—ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নতুন সাঙাত গ্যাট/রবীন চক্রবর্তী	অ.-ডি. '94/6
আমাদের কথা	জা.-মা. '94 —এ.-জু. '95 অ.-ডি. '95—অ.-ডি. '97/1
এ	
এইডস, থাইল্যান্ড ও সংবাদ মাধ্যম/সংকলক	জু.-সে '94/19
এইডস সম্ভাবনা—ভারতে/প্রদীপ দত্ত	ঐ/23
একজন অবিজ্ঞানীর বিজ্ঞান প্রশ্ন/শুভেন্দু দাশগুপ্ত	এ.-সে. '96/2
একজন সরকারি ডাক্তার হিসাবে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে যা চাই/তন্ময় চৌধুরী	অ.-ডি '97/5
এলেবেলে বোলচাল/অমল সোম	জা.-জু '97/4
ক	
কলকাতার তপসিয়া অঞ্চল ও তার পরিবেশ/মাজহার উল হোসেন	জু.-সে. '95/16
কস্টিক কারখানা—পরিবেশ দূষণ	জা.-মা. '94/3
"কাকদ্বীপের এক মা"—নাটক নয় ঘটনা/বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত	এ.-জু. '94/3
কিসকি রক্ষা [চিত্র সমালোচনা]	অ.-ডি. '94/39
কিস্যা ক্যাকটাস অর্কিড কা [অ.] / [অনু.: কাজল রায়]	জা.-মা. '94/33
কেরল ও উন্নয়ন নিয়ে আজকের দুর্ভাবনা/রবীন চক্রবর্তী	এ.-সে. '96/11

রচনা/লেখক	সংখ্যা/পৃষ্ঠা
কোঙ্কন রেল-প্রজেক্ট / [সং. রবীন চক্রবর্তী]	জা.-মা. '95/16
গ	
গণবিজ্ঞান আন্দোলন : একটি আঞ্চলিক উদ্যোগ / বলাই	জু.-সে ' 97/17
গণেশ জনগণেশ ও বিজ্ঞান	জু.-সে '95/1
গতি কতখানি প্রগতির সহায়ক / রবীন চক্রবর্তী	এ.-সে. '96/14
গুণতন্ত্র [অন্যস্বাদে] / বিষ্ণু বিশ্বাস	জা.-মা. '94/22
গ্রহণ চশমা নিয়ে বিতর্ক	অ.-ডি. '95/12
গ্রহণ চশমার ভালমন্দ	ঐ/14
চ	
চারপাশে যা দেখছি	
আলকাতরা দূষণ : একটি আর্তি / অলোক চ্যাটার্জি	এ.-জু. '94/29
চাষের জমিতে বি এস এফ হানা / সুবোধ দাশ, শক্তি ভট্টাচার্য	এ.-জু. '94/27
ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স থেকে / অরুণ পাল	জা.-মা. '94/25
পুকুর বোজানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ/কাজল	জা.-মা. '94/24
নির্মাণকর্মীরা আজও অসংগঠিত / র.চ.	জু.-সে. '94/25
নৈটীর জলায় ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স দূষণ ঘটাচ্ছে / প্রভাত কর্মকার	জা.-মা. '95/37
মফস্বলের চালচিত্র / পরিদর্শক	জু.-সে. '94/26
শ'ওয়ালেস কোম্পানীর গ্যাস / উত্তরপাড়া বিজ্ঞান ক্লাব	জা.-মা. '94/27
শুয়োরের খামার ও কয়েকজন নাট্যকর্মী / অপূর্ব সাহা, মানিক পাইন	অ.-ডি. '94/24
স্বাস্থ্য ও পরিবেশ : চটকল শ্রমিক এলাকায় / বিশ্বজিৎ	জু.-সে. '94/28
চিঠিপত্র / রাজীব সিংহ	এ.-সে. '96/24
ঐ / সুদীপ্ত সরস্বতী	জু.-সে. '95/28
চিলিকা বাঁচাও আন্দোলন : একটি রিপোর্ট / অমিতা	জা.-মা. '94/15

রচনা/লেখক	সংখ্যা/পৃষ্ঠা
ছ	
ছড়া / দিলীপ কুমার বৈদ্য	এ.-সে. '96/4
ঐ [খুড়োর চোখে সূর্যগ্রহণ] / দিলীপ কুমার বৈদ্য	জু.-সে. '95/29
জ	
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তৃতীয় বিশ্বই লক্ষ্য---কেন / কাজল রায়	অ.-ডি. '94/20
জনস্বার্থ মামলায় বিব্রত জনগণের সেবকগণ / রবীন চক্রবর্তী	জা.-জু. '97/25
ড	
ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স—একটি স্বপ্নের অপমৃত্যু	অ.-ডি. '96/11
ডিপো-প্রভেরা : একটি বিপজ্জনক গর্ভ নিরোধক / অমিতা	জু.-সে. '94/33
'ডিপো-প্রভেরা' নিয়ে বিক্ষোভ / পূরবী ঘোষ	অ.-ডি. '94/27
দ	
দেবতার ব্যাধি / অমিতাভ বসু রায়	জা.-মা. '96/3
ধ	
ধর্ম ও বিজ্ঞান [অ.] / অ্যালবার্ট আইনস্টাইন [অনু. সুভাষ]	অ.-ডি. '96/2
ন	
নরপ্ল্যান্ট আসছে, একটু ভাবুন / অমিতা	এ.-জু. '94/31
নর্মদা বাঁধে বাধা : বিকাশ না বিনাশ / র.চ.	জা.-মা. '95/26
নর্মদা আন্দোলনের বরোদা অফিসে ভাঙচুর [অ.]/ বীণা শ্রীনিবাসন [অনু. রবীন চক্রবর্তী]	জু.-সে. '94/15
নর্মদায় যা চলছে / নিরঞ্জন হালদার	এ.-জু. '95/28
নয়া অর্থনীতি : পুরনো চিত্র / রবীন চক্রবর্তী	এ.-জু. '95/24
নিউক্লিয়ার বোমার পরীক্ষা	জু.-সে. '95/22
নিরাশ্রয়, নিঃসঙ্গতায় দিন গুণছেন যারা / সং. কাজল রায়	অ.-ডি. '95/26
প	
পরিক্রমা	
কলকাতার ট্রাম — ডেনমার্কবাসীর দুর্ভাবনা	এ.-জু. '94/37
খৃস্‌মাসে ফরাসী উপহার / র.চ.	অ.-ডি. '95/31
গ্লোবালাইজেশনের প্রয়োজন / র.চ.	জা.-মা. '94/35
জল কদ্দূর গড়ায় / র.চ.	অ.-ডি. '94/36
জেলার উন্নয়নে মহাকাশ দপ্তর	এ.-জু.'94/38
ঠিকে শিক্ষক / র.চ.	এ.-সে. '96/22
দেড় কোটি বনাম কুড়ি / র.চ.	অ.-ডি. '94/36
দেশের তাবৎ গ্রামে টেলিফোন	এ.-জু. '94/38
নর্মদা বাঁধ প্রকল্প / র.চ.	জা.-মা. '94/37
নর্মদা উপত্যকায় এখন / র.চ.	জু.-সে. '94/38
নিউক্লিয়ার এনার্জির হাল হকিকৎ / র.চ.	অ.-ডি. '97/30
নিউক বিরোধী জনস্বার্থ মামলা হোক/র.চ.	জা.-জু. '97/31
প্লুটোনিয়াম নয় ইউরেনিয়াম এবার / র.চ.	এ.-জু. '95/30
প্লুটোনিয়াম চোরাই / র.চ.	অ.-ডি. '94/36
বিশ্বভারতীর আচার্য সঙ্কট / র.চ.	অ.-ডি. '96/23
B A (love) Hons. কোর্স / র.চ.	অ.-ডি. '95/30
ভূপালের কান্না থামে নি আজও / র.চ.	অ.-ডি. '95/29
মানুষের ক্লোন আর কতদূর / র.চ.	জা.-জু. '97/31
মেঘালয়ে ইউরেনিয়াম / র.চ.	জা.-মা. '95/39
ম্যাড-কাউ ডিজিস / র.চ.	জা.-মা. '96/25
রি-সাইক্লিং / র.চ.	জা.-মা. '96/26
শব্দ নয় : আদালত বলেছে / র.চ.	জা.-জু. '97/30
সিটিবিটি / র.চ.	জা.-মা. '96/23
স্কুল পাঠ্যে মানবাধিকার বিষয়	জু.-সে. '94/37
পশ্চিমবঙ্গ : ঠিকানা বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল	অ.-ডি. '95/16
পারস্পরিক সহায়তা—বিবর্তনের একটি উপাদান [অ.]/ পিটার ক্রপটকিন [অনু. শুভাশিস মুখোপাধ্যায়]	জু.-সে '97/13
পালক নীতি : একটি পত্রিকার নাম	এ.-জু. '95/39
পিটার আলেকজান্ডার ক্রপটকিন / সু. চ.	জু.-সে. '97/9

রচনা/লেখক	সংখ্যা/পৃষ্ঠা
পেটেন্ট আইন ও নিম : নয়া সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন / অভ্র চক্রবর্তী	অ.-ডি. '94/3
পুস্তক পরিচিতি	
আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও উৎস সন্ধানে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জোসেফ নীডহাম / মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	অ.-ডি. '97/17
পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের দিনলিপি / বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত	অ.-ডি. '95/3
পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখুন / রবীন চক্রবর্তী	জু.-সে. '95/3
পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের দিনলিপি লেখাটির সম্পর্কে দুচার কথা/ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	এ.-সে. '96/21
প্রসঙ্গ : উনিশ শ সাতানব্বই-এর বইমেলা	
'অগ্নিশুদ্ধি' / রীনা দত্ত	জা.-জু. '97/19
বইমেলার আগুন/মানস কুমার চিনি	জা.-জু. '97/19
বইমেলা '৯৭/নিশীথ চৌধুরী	জা.-জু. '97/18
স্মৃতি, সুখের আবার বেদনারও/তপন বিদ	জা.-জু. '97/16
প্রসঙ্গ : কৃষি	
কৃষকদের কারগিল আক্রমণ/শুভেন্দু দাশগুপ্ত	জা.-মা. '94/8
ক্ষতিকর পোকা ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি/ কালমেঘ মণ্ডল	জা.-মা. '95/3
জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস / কালমেঘ মণ্ডল	এ.-জু. '95/7
নতুন কৃষি প্রযুক্তি : কৃষকদের ভাবনায় / অরূপরতন মুখোপাধ্যায়	এ.-জু. '94/10
প্রযুক্তি এবং স্বনির্ভরতা : ভারতীয় কৃষি কোন পথে / অরূপরতন মুখোপাধ্যায়	জা.-মা. '94/12
বীজ নিয়ে কৃষক আন্দোলন / শুভেন্দু দাশগুপ্ত	এ.-জু. '94/8
প্রসঙ্গ গোয়া	
খেলার ছলে [অ.] / [অনু. বনশ্রী, তপন]	জু.-সে '94/3
পর্যটন পরিবেশ ও উন্নয়ন / [সং সুরঞ্জন কর]	ঐ/4
প্রসঙ্গ ঃ বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ [পুনর্মুদ্রণ] / পার্থ সেন	জু.-সে. '95/20
প্রসঙ্গ ম্যালেরিয়া	জা.-মা. '95/19
প্রসঙ্গ শিল্প-দূষণ	
সুপ্রীম কোর্টের রায় এবং অসহায় ট্রেড ইউনিয়ন	জু.-সে. '95/11

রচনা/লেখক	সংখ্যা/পৃষ্ঠা
প্লেগচিত্র	
১. 'প্লেগ মহামারী'(!)-র চালচিত্র / [সং. শর্মিলা]	জা.-মা. '95/28
২. ঐ / ঐ	এ.-জু.'95/22
৩. দিল্লীতে প্লেগ নিয়ে প্রতিবাদ ধর্ণা	ঐ/32
৪. একটি দাবীপত্র / [অনু. সুভাষ গাঙ্গুলী]	ঐ/34
ফ	
ফসলের জীনগত বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি / কালমেঘ মণ্ডল	অ.-ডি. '94/14
ফিলিপাইনসের পেপসি বিরোধী আন্দোলন	অ.-ডি. '94/29
ব	
বামফ্রন্টের শিল্পনীতি : বিরানব্বই থেকে সাতাত্তর / রবীন চক্রবর্তী	জা.-মা. '96/21
বিনোদনকেন্দ্র বনাম এক অশীতিপর বৃদ্ধ / শ্রীমন্ত কুমার মণ্ডল	এ.-সে. '96/18
বিপ্লবকে হারালাম আমরা	জু.-সে. '97/5
বিষয় : পরিবেশ [১ম পর্ব] / রবীন মজুমদার	
১. দূষণ সমস্যা শুধু প্রযুক্তিগত নয় মানবিকও	এ.-জু. '94/12
২. বিবর্তনের গতিপথে হস্তক্ষেপই কি দূষণের মূল কারণ	জু.-সে. '94/11
৩. পরিবেশ দূষণের রকমসকম ও ক্ষয়ক্ষতি (১ম অংশ)	অ.-ডি. '94/9
৪. ঐ (২য় অংশ)	জা.-মা. '95/11
৫. ঐ (৩য় অংশ)	এ.-জু. '95/15
ঐ [দ্বিতীয় পর্ব] / ঐ	
১. দূষণের মাপ ও মাত্রা (১ম অংশ)	জু.-সে. '95/7
২. ঐ (২য় অংশ)	অ.-ডি. '95/18
৩. ঐ (৩য় অংশ)	জা.-মা. '96/14
৪. দূষণের মাপ ও মাত্রা : শব্দ দূষণ	এ.-সে. '96/5
৫. ঐ : বর্জ্য শোধন	অ.-ডি. '96/17
ঐ [তৃতীয় পর্ব] / ঐ	
১. পরিবেশ আইনকানুন : নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য (১ম অংশ)	জা.-জু. '97/20
২. ঐ (২য় অংশ)	অ.-ডি. '97/9
বিষাক্ত বর্জ্যের বাণিজ্য	জা.-মা. '95/15
বিশ্বকাপ : একটু ভাবুন	জু.-সে. '94/39

রচনা/লেখক	সংখ্যা/পৃষ্ঠা
ভ	
ভূমিকম্প কি ও কেন	এ.-জু. '94/24
ভূমিকম্পের পূর্বাভাস	ঐ/25
ম	
মতামত	
একজন অবিজ্ঞানীর বিজ্ঞান প্রশ্ন প্রসঙ্গে / সুভাষচন্দ্র সামন্ত	জা.-জু. '97/28
প্রসঙ্গ : "দেবতার ব্যাধি" রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	জু.-সে. '97/19
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ / বুদ্ধদেব বাগচী	জা.-জু. '97/29
সমালোচনার উত্তর / অমিতাভ বসুরায়	জু.-সে. '97/21
মহরাষ্ট্রের ভূমিকম্প—একটি পর্যালোচনা / তপন চক্রবর্তী	এ.-জু. '94/15
মহিলা যৌনকর্মী সম্মেলন	জা.-মা. '96/28
মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলাদের জরায়ু ছেদন / [সং. অমিতা]	অ.-ডি. '94/32
মানবিক অধিকার ও সাংবাদিকতা / সুভাষ গাঙ্গুলী	জা.-জু. '97/10
মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন মৌলের আবিষ্কার [অ.] / জন মুর [অনু. সুদীপ্ত সরস্বতী]	জু.-সে. '96/28
মেডিক্যাল আবর্জনা পোড়ানোর বিপদ / র.ম.	এ.-সে. '96/8
Memorandum for the Protection of Human Rights of Physically Ill Persons	অ.-ডি. '97/7
য	
যতমন তত মত / বাসুদেব মুখোপাধ্যায়	জু.-সে. '97/3
র	
রাজস্থান—নারী বিকাশ প্রকল্প / [সং. কাজল রায়]	এ.-জু. '95/3
রামকৃষ্ণ মিশনের দাবী নাকচ করল সুপ্রীম কোর্ট	জু.-সে. '95/19
রিপোর্ট	
শহরের আবর্জনা ও হাসপাতালের বর্জ্য/ স্বপন দাস	অ.-ডি. '97/15
রোগীদের অধিকার : অভিজ্ঞতা ও প্রস্তাব/ শুভেন্দু দাশগুপ্ত	অ.-ডি. '97/2
ল	
লাভ ক্যানাল—এখন অতীতের পাতায় [অ.] / [অনু. কাজল রায়]	জু.-সে. '94/31
শ	
শুখা মুক্তি অভিযান / [সং. রবীন চক্রবর্তী]	এ.-জু. '95/12
স	
সততার খেসারত : ডা. ওরাপুনের কাহিনী/ [সং. রবীন চক্রবর্তী]	অ.-ডি. '96/20
সরকারী স্বাস্থ্য—একটি সমীক্ষা	জা.-মা. '94/29
সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ও নারী আন্দোলনের প্রতিবাদ	জু.-সে. '95/26
হ	
হাকিম শেখ ও মুমূর্ষ রোগীর চিকিৎসা পাবার মৌলিক অধিকার / স্বপন দাস	এ.-সে. '96/19

[সংক্ষেপ সূচি ঃ জা.-মা.—জানুয়ারি-মার্চ; এ.-জু.—এপ্রিল-জুন; জু.-সে.—জুলাই-সেপ্টেম্বর; অ.-ডি.—অক্টোবর-ডিসেম্বর; এ.-সে.—এপ্রিল-সেপ্টেম্বর; জা.-জু.—জানুয়ারি-জুন; সং—সংকলক; অনু.—অনুবাদক; অ.—অনুবাদ রচনা।]

আগামী নতুন বছর জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* পত্রিকা পা দেবে কুড়ি বছরে। সমস্ত পাঠক/গ্রাহক/ বিজ্ঞাপন দাতা/শুভানুধ্যায়ী সবাইকেই *বিওবি* আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আগামী সংখ্যা প্রকাশিত হবে বইমেলার আগেই।

VIGNAN O VIGNANKARMI Vol XIX No.4 October – December 1997 Rn. No. 34929/79

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী, পি 252, লেক টাউন, ব্লক A, কলকাতা 700 089

গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন। কিছু কিছু পুরনো
সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। প্রয়োজনে লিখুন।
লেখা পাঠান। সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্কের যে
কোনো বিষয়ে স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক রিপোর্ট,
অনুসন্ধান, সমীক্ষা ইত্যাদি সাদরে বিবেচিত হবে।
এজেন্সি দেওয়া হয়। একসঙ্গে অন্তত পাঁচ কপি।
কমিশন শতকরা পঁচিশ।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি,
117 কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা 700 009 থেকে মুদ্রিত।